গীবত
বা
পিছনে নিন্দা

মূল

মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌবী (রঃ)

অনুবাদ

শাইখুল হাদীস
মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক

পরিবেশনায়

সোলেমানিয়া বুক হাউস

৩৬, ৪৫, বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

প্রথম মূল

প্রথম শাখা

গীবতের সংজ্ঞা

কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। শরীঅতের পরিভাষায় তাকে গীবত বলা হয়। মুখে, লেখনীতে, অঙ্গ দ্বারা বা অন্য যে কোন প্রকারে করা হোক, তা গীবত বলেই গণ্য হবে। যার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে সে কাফের মুসলিম যাই হোক। বর্ণিত দোষ যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে থাকে তবেই তা গীবত হবে। অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে। এ সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা সম্বলিত হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক বেঁটে মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আগমন করেন। মহিলা চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তার বেঁটে হওয়ার দোষ বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে! তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো তার অবাস্তব কোন দোষ বর্ণনা করিনি। অবশ্য আমি তাঁর খর্বাকৃতি হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেছি। আর প্রকৃতপক্ষেই তার মাঝে এ ত্রুটি রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যদিও তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু যখনই তুমি তার খর্বাকৃতি হওয়ার দোষ বর্ণনা করেছ, তখন এটাই গীবত হয়ে গেল। -(তাম্বীহুল গাফেলীন- গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান, গীবত কাকে বলে? তাঁরা নিবেদন করলেন,

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ—গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে।

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বর্ণনাকৃত দোষ যদি সে ভাইয়ের মাঝে থাকে তা হলেও কি গীবত হবে? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমরা কারো সঠিক দোষ বর্ণনা কর তবেই তা গীবত, অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে। —(মাআলেমুত তানযীল)

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব

উল্লিখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اَخَاكَ— তোমার ভাই বলে ইঙ্গিত করেছেন, তোমরা যার গীবত করবে, যদিও সে তোমার সাথে কোন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে তোমার ভাই। এর তিনটি কারণ— প্রথমতঃ তোমার এবং তার ঊর্ধ্বতন পিতা হযরত আদম (আঃ), দ্বিতীয়তঃ তোমার এবং তার ঊর্ধ্বতন মাতা হযরত হাওয়া (আঃ); তৃতীয়তঃ তুমি এবং সে মুসলমান। আর মুসলমান পরস্পরে ভাই। অতএব, প্রত্যেকেরই আপন ভাইয়ের গীবত হতে যথাশক্তি বেঁচে থাকা, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় ঘটনা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— وَالْغِيْبَةُ اَنْ تَذْكُرَ الْمَرْءَ بِمَا فِيْهِ—কারো মাঝে বিদ্যমান দোষ বর্ণনাই গীবত।

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো মনে করে আসছিলাম, কারো অবাস্তব দোষ বর্ণনা করা গীবত। তিনি এরশাদ করলেন, তা তো মিথ্যা অপবাদ।

—(তাফসীর দোররে মনসূর)

গীবত সম্পর্কে মনীষী বাণী

তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম (রঃ) বলেন, إِذَا قُلْتَ فِى الرَّجُلِ مَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ — তুমি কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তো গীবত করলে, অন্যথায় তা মিথ্যা অপবাদ।

—(ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)— কিতাবুল আসার)

ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

বর্তমানকালে সর্বসাধারণ এমনকি বিশিষ্ট লোকেরাও গীবতের মত জঘন্য নিন্দনীয় কর্মে লিপ্ত রয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী গীবতের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা বর্ণনা করেন।

কেউ কেউ বলেন, সামনে বলা যায় না, কারো এমন দোষ বর্ণনা করাই গীবত। সামনে বলা যায়, এমন দোষ বর্ণনা করলে গীবত হবে না। অথচ ব্যাপারটা এমন নয়।

গীবতরত এক ব্যক্তিকে আমি (মূল গ্রন্থকার) বললাম, আরে সাহেব! অন্যের গীবত করছেন কেন? মানুষের দোষ বর্ণনা করে চলেছেন। যেহেতু লোকটি ছিল ভ্রষ্ট বিশ্বাসী, তাই সে বলল, আমি পশ্চাতে যার দোষ বর্ণনা করছি, তার সামনেও তা বলতে ভয় পাই না; সুতরাং এটা গীবত নয়। অথচ ব্যাপারটা কথিত রূপ নয়।

পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহে গীবতের যে সংজ্ঞা বলা হয়েছে, সেখানে সম্মুখে দোষ বর্ণনার শর্তারোপ করা হয়নি। বরং গীবতের সাধারণ সংজ্ঞা বর্ণনা করে কারো অবর্তমানে তার দোষ বর্ণনা করাকেই গীবত বলা হয়েছে।

কিছু লোক এও বলে, কারো অসত্য দোষ বর্ণনাই গীবত। সত্য দোষ বর্ণনা গীবত নয়। এরূপ ধারণা ঠিক নয়; বরং উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহে কারো অসত্য দোষ বর্ণনাকে মিথ্যা অপবাদ বলা হয়েছে। অতএব, কারো সত্য দোষ বর্ণনা গীবত নয়— এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আবার কিছু লোক এও বলে, মানুষ জানে না— কারো এমন দোষ বর্ণনা করাই গীবত। অতএব, সকলেই জানে, কারো এমন দোষ বর্ণনা করলে তা

গীবত হবে না। তাই এমন লোকদের কাউকে যদি বলা হয়, আপনি গীবত করছেন কেন? প্রত্যুত্তরে সে বলে, এটা গীবত নয়। কেননা, আমি যে দোষ বর্ণনা করছি তা কোন রাখাঢাকা বিষয় নয়, সবাই এ সম্পর্কে অবহিত। আমি বর্ণনা করার ফলেই মানুষ সংশ্লিষ্ট লোকটির কথিত দোষ সম্পর্কে অবহিত হবে এমন নয়।

এও মানুষের নিছক ভ্রান্ত ধারণা। কেননা, কারো প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ, গোপন প্রকাশ্য, যে কোন ধরনের দোষই বর্ণনা করা হোক না কেন, তা গীবতই হবে। বরং বর্ণিত দোষ যদি সর্বসাধারণ্যে অপ্রসিদ্ধ হয় তবে এতে গীবত এবং অন্যের কুৎসা রটনা— এ দুইটি গোনাহ হবে। বর্ণিত দোষ সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ হলে তা হবে গীবত। কুৎসা রটনা নয়। এ অবস্থায়ও গীবতের গোনাহ অবশ্যই হবে।

এখন প্রশ্ন হল, কারো সর্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ দোষ বর্ণনা গীবত হল কি করে?

এ প্রশ্নের জবাব উপরে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘটনায় রয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মহিলার খর্বাকৃতি হওয়ার বর্ণনাকে গীবত বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয় শাখা

গীবতের শ্রেণীবিভাগ

গীবতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনাকে ছয় ভাগে করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

গীবতের প্রথম ভাগ তিন প্রকার।

১. মুসলমানের গীবত ঃ কোন মুসলমানের গীবত অকাট্য হারাম। আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন— وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا — তোমরা একে অপরের গীবত করো না।

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে পরস্পরের গীবত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, আয়াতে كُمْ সর্বনাম দ্বারা মুসলমানদেরকেই উদ্দেশ করা

হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই হল, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের গীবত না করে।

২. **যিম্মী (অমুসলিম) নাগরিকের গীবত** ঃ যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করছে, তাদের গীবতও হারাম। কেননা, কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেলে তার জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদ মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদের মতই সম্মানার্হ হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানি যেমন হারাম, অধীনস্থ কাফেরদের জীবন, সম্মান এবং সহায় সম্পদহানিও তেমনি হারাম। দোররে মোখতারসহ অন্যান্য ফেকাহ গ্রন্থে এ মাসআলা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৩. **হরবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবত** ঃ ফেকাহ শাস্ত্রের বিধান মতে, যেসব কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ নয়, তাদের গীবত জায়েয। কেননা, যেখানে ফাসেক-পাপাচারী মুসলমানের গীবত জায়েয, সেখানে মুসলমানদের শত্রু কাফেরদের গীবত তো আরও উত্তমরূপেই জায়েয হবে।

হযরত ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا আয়াতের তাফসীরে লেখেন— কাফেরের গীবত জায়েয, এ দ্বারা সম্ভবতঃ হরবী কাফেরকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় ভাগ

মৃতদের গীবত ঃ যেমন জীবিতদের গীবত হারাম, অনুরূপ মৃতদেরকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা, তাদের দোষ বর্ণনা করা, গীবত করাও হারাম। যদিও তারা জীবিতাবস্থায় গোনাহে লিপ্ত থেকে নিজেদের সময় বরবাদ বিনষ্ট করুক। জীবিতদের অনুরূপ মৃতদের গীবত থেকেও বিরত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর তাকিদ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশা করেন, إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَدَعُوْهُ وَلَا تَقَعُوْا فِيْهِ — তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও। তার গীবত করো না।

—(আবু দাউদ—কিতাবুল বিররে ওয়াসসেলাহ)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, لَا تَسُبُّوا الْمَوْتٰى فَاِنَّهُمْ اَفْضَوْا مَا قَدَّمُوْا — মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা,তারা নিজেদের আমলের প্রতিদানপ্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গেছে।

— (কিতাবুত তারগীব ওয়াততারহীব)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ — তোমরা মৃতদের সদগুণসমূহ আলোচনা কর, তাদের মন্দ আলোচনা থেকে বিরত থাক।

— (আবু দাউদ)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

لَا تَذْكُرُوْا مَوْتَاكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ فَاِنَّهُمْ اَنْ يَكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْثَمُوْا وَ اِنْ يَكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيْهِ

— তোমরা নিজেদের মৃতদের সদগুণাবলী ব্যতীত আলোচনা করো না। কেননা, তারা জান্নাতী হলে তাদের গীবত করে তোমরা গোনাহগার হবে। আর জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। —(এহইয়াউল উলুম)

আমি (মূল গ্রন্থকার) বলছি, হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু ছাড়াও বুদ্ধি-বিবেক বলে, মৃতদের গীবত নাজায়েয। এর কারণ চারটি। প্রথমতঃ মৃতরা জীবিতদের গীবত করতে পারে না। সুতরাং জীবিতদেরও উচিত মৃতদের গীবত না করা এবং তাদেরকে কোন কষ্ট না দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ জীবিতরা মৃতদের দ্বারা উপকৃত হয়। জীবিতরা মৃতদেরকে দেখলে, তাদের কাছে বসলে আখেরাতের কথা স্মরণ হয়, দুনিয়া ধ্বংসশীল বলে অনুভূত হয়। অতএব, জীবিতদের কর্তব্য মৃতদের উপকার করা, তাদের সুকর্মের বিনিময় প্রদান করা। যেমন মৃতদের বাগযন্ত্র প্রতিরুদ্ধ হয়ে আছে, জীবিতদেরও নিজেদের বাগযন্ত্র তেমনি প্রতিরুদ্ধ করে রাখা উচিত। মৃতদের দোষ আলোচনা করা অনুচিত।

তৃতীয়তঃ মৃতদের গীবতে তাদের নিকটাত্মীয় স্বজনের কষ্ট হয়।

চতুর্থতঃ মৃত ব্যক্তি জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তার গীবত নিরর্থক আর জান্নাতী হলে তার গীবত নিষিদ্ধ। যেক্ষেত্রে মৃতের জাহান্নামী হওয়া সন্দেহপূর্ণ, সেক্ষেত্রেও শরীঅত গীবত নিষিদ্ধ করেছে।

নিম্নে মৃতদের গীবতের অপকৃষ্টতা সম্পর্কিত কয়েকটি উপদেশমূলক ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বেশী বেশী কবরের কাছে বসতেন এবং কবরস্তানে গমন করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এমন লোকদের নিকট বসি যারা আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে চলে আসলে তারা আমার গীবত করে না, কিন্তু জীবিতরা এর বিপরীত। —(এহইয়াউল উলূম ঃ কিতাবুল আমওয়াত)

দ্বিতীয় ঘটনা

লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কবরস্তানসমূহে বেশী বেশী যান কেন? জবাবে তিনি বললেন, কবরবাসী আখেরাত স্মরণ করিয়ে আমাদের উপকার সাধন করে। তারা আমাদের গীবত করে না, আমাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করে না। এ কারণেই আমি তাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করি না এবং বেশী বেশী তাদের সাহচর্য অবলম্বন করি। —(এহইয়াউল উলূম)

তৃতীয় ঘটনা

আমার (মূল গ্রন্থকার) আব্বা একদিন বললেন, এক লোক বেশী বেশী সূরা লাহাব পাঠ করত। যদিও আবু লাহাব কাফের ছিল। কিন্তু ছিল তো পাপীকুলের মুক্তির জন্য সুপারিশকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আর সূরা লাহাবে আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের উপর লানত এবং তার মন্দ প্রতিদানপ্রাপ্তির কথা বলেছেন। লোকটির সর্বদা সূরা লাহাব পাঠ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খারাপ মনে হয়। তিনি লোকটির উদ্দেশে বললেন, ওহে! তোমার কি অন্য কোন সূরা মুখস্থ নেই।

চতুর্থ ঘটনা

আমার (মূল গ্রন্থকার) সম্মানিত বুযুর্গগণের মধ্য থেকে এক ওলীআল্লাহ হযরত মাওলানা এযহারুল হক সাহেব লখনৌবী ইনতেকাল করেন। ইনতেকালের সময় তাঁর মুখ থেকে কালেমা বের হয়নি। ইনতেকালের পর উপস্থিত লোকজন তাঁর গায়ের উপর চাদর ছড়িয়ে দিয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থাপনায় লেগে যায়। উপস্থিতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ভর্ৎসনার সূরে বলল, প্রকাশ্যত নেহায়েত মোত্তাকী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে মুখ থেকে কালেমাও বের হল না। এতে সবাই মনে খুব ব্যথা পান। ইত্যবসরে মরহুম মাওলানা সাহেব তাঁর পদদ্বয় সোজা করে সশব্দে কালেমা শরীফ পড়েন। উপস্থিত লোকজনের কানে মাওলানা সাহেবের কালেমা পাঠের আওয়াজ পৌঁছার পর যারা মুখে কালেমা উচ্চারিত না হওয়ায় ভর্ৎসনা করেছিল, উপস্থিতরা ভর্ৎসনাকারীদেরকে খুবই ভর্ৎসনা তিরস্কার করেন। এ সম্পর্কে নিম্নে উপদেশপূর্ণ আলোচনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম উপদেশ

মৃত্যুকালে কারো মুখ থেকে কালেমা বের না হলে, অথবা চেহারা কালো হয়ে গেলে, অথবা কবরে আযাবের কোন উপকরণ পরিদৃষ্ট হলে, অথবা ভূগর্ভস্থ কোন জীব যেমন সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি প্রকাশ পেলে যারা এ বিষয়ে অবহিত হয়, তাদের উচিত এসব জনসাধারণ্যে প্রকাশ না করা। উপরন্তু তার গোনাহগার হওয়ার সংবাদ ফলাও না করা, এতে তার জীবিত আত্মীয় স্বজন কষ্ট পাবে। এ ব্যাপারে এটাই পালনীয় বিধান।

দ্বিতীয় উপদেশ

মৃতের সমালোচনা বা দোষ বর্ণনা করার যে বিধান আলোচিত হয়েছে, সেই আলোচনার আলোকে ইয়াযীদ এবং হাজ্জাজের নিন্দাবাদও কোন ভাল কাজ নয়। যদিও কেউ কেউ ইয়াযীদ এবং হাজ্জাজের কুফরীর প্রবক্তা। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সূত্রে এ অভিমত 'মাতালেবুল মোমেনীন' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনই শ্রেয়। কেননা, নীরবতা অবলম্বনেই সাবধানতা নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইয়াযীদ বা হাজ্জাজের দোষ বর্ণনায় এবং নিন্দাবাদে কোন সওয়াবও নেই।

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগের গীবতও দুই প্রকার।

১. বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত ঃ বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবত সম্পর্কিত বিধান ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (রঃ) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ফকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম।

আমার (গ্রন্থকার) মতে, যে অল্প বয়স্ক ছেলে মোটামুটি বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যে নিজের প্রশংসায় সন্তুষ্ট ও দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয়, যেমন— স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হাবা গোছের অল্প বয়স্ক ছেলে, তার গীবত দুরস্ত নয়। আর এরূপ ছেলে বা পাগলের উত্তরাধিকারী থাকলেও গীবত হারাম। কেননা, যদিও এ ছেলে এবং পাগল নির্বোধ, কিন্তু এদের গীবত করলে, দোষ বর্ণনা করলে তার উত্তরাধিকারীদের মানসিক কষ্ট হবে। হাঁ, নির্বোধ ছেলের দোষ বর্ণনা দ্বারা যদি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তা হলে তার সামনে অথবা পিছনে উভয় অবস্থায়ই জায়েয।

২. পাগলের গীবত ঃ যে হাবা ছেলে বা পাগল প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয, কিন্তু কারো গীবত থেকে রসনাকে যথাসাধ্য বিরত রাখাই উত্তম।

চতুর্থ ভাগ

এ ভাগের গীবতসমূহ ছয় প্রকার।

১. দৈহিক কাঠামোর গীবত ঃ কাউকে হেয় করার উদ্দেশে তার দৈহিক গীবত করা, যেমন— এরূপ বলা, অমুক স্থূলকায়, বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ ছোট, ঘোর কালো, একেবারে বধির, কারো কথাই শুনতে পায় না, অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না, তার নাক কাটা, লম্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বড়, অথবা সে বিশ্রী, এভাবে কারো দৈহিক দোষ বর্ণনা করা এবং তাকে তুচ্ছ করার উদ্দেশে হাসা প্রভৃতি গীবত; সুতরাং হারাম।

—২

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এরশাদ করেন, حَرَّمَ اللّٰهُ اَنْ يُّغْتَابَ الْمُؤْمِنُ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ —আল্লাহ তাআলা যেমন মৃতের গোশত হারাম করেছেন, তেমনি কোন মোমেনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের গীবতও হারাম করেছেন। —(তাফসীরে দোররে মনসূর)

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একদা আল্লামা ইবনে সিরীন (রঃ) এক লোকের দোষ বর্ণনায় বলেন, সে কালো। অতঃপর বললেন, আমি মনে করি আমি তার গীবত করেছি। সুতরাং এ গোনাহ হতে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সফিয়ার বেঁটে হওয়া কি আপনার পছন্দনীয়। এতে তিনি এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি এমন এক কথা বললে, যা সমুদ্রের পানিতে মিলালে তা পানি বিনষ্ট করে দেবে। —(আবু দাউদ— বাবুল গীবত)

তৃতীয় ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) খর্বাকৃতি হওয়ায় তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ হাসাহাসি করতে শুরু করলে আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন— يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ —হে মোমেনগণ! কোন পুরুষ কোন পুরুষকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারীর চাইতে উত্তম এবং কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোককে নিয়ে হাসবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারিণীর চাইতে উত্তম।

চতুর্থ ঘটনা

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) একদিন দাওয়াতে কারো গৃহে গমন করেন। দস্তরখানে বসে উপস্থিত লোকজন এক ব্যক্তির নাম করে বলল, অমুক আসেনি। উপস্থিতদের একজন বলল, সে স্থূলকায়, তাই আসতে দেরী হচ্ছে। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) না খেয়েই উঠে চলে যান। নিজেকে নিজে বললেন, তোমার কারণে গীবত শুনতে হল। কেননা, তুমি ক্ষুধার্ত না হলে দাওয়াতে গমন এবং গীবত

শুনতে হত না। এর পর তিন দিন পর্যন্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে। প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট কষ্ট দেন।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন)

পঞ্চম ঘটনা

একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সঙ্গী সাথীদের সাথে পথ চলছিলেন। চলার পথে তাঁরা দুর্গন্ধময় একটি মরা কুকুর দেখতে পান। এ মরা কুকুরের গন্ধ তাঁর সঙ্গী সাথীদের খুবই অপছন্দ হয়। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, কুকুরটির দাঁতের শুভ্রতা কেমন ভাল লাগছে, যেন অন্ধকারে ভোরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ কথা বলে তিনি সঙ্গীদের ইঙ্গিত করেছেন, তোমাদের উপর তাজ্জব হলাম। তোমরা কুকুরটির দোষ তো দেখতে পেলে, কিন্তু সেটির সুন্দর দিকটা দেখলে না।

ষষ্ঠ ঘটনা

হযরত নূহ (আঃ) চার চক্ষু বিশিষ্ট একটি কুকুর দেখতে পান এবং চার চোখ বিশিষ্ট হওয়াকে সেটির বিশ্রী হওয়া ভেবে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন। আল্লাহর হুকুমে কুকুরটি বলে উঠে, ওহে নূহ! আপনি আমাকে তুচ্ছ ভাবছেন। আল্লাহ তাআলাই আমাকে এরূপ বানিয়েছেন। যদি আমার বানানোটা আমার এখতিয়ারেই থাকত, তা হলে আমি কুকুরই বা হব কেন? কুকুরটির কথা শুনে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অন্তরে ভীষণ ভয় সঞ্চারিত হয়। তিনি খুব বেশী কান্নাকাটি এবং বিলাপ করেন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় নূহ— অত্যধিক কান্নাকাটি এবং বিলাপকারী।

—(হাকায়েক গ্রন্থ হতে নুযহাতুল মাজালেস—আদব অধ্যায়)

উপদেশবাণী

হযরত মোআবিয়া বিন কোররা (রাঃ) বলেন— لَوْ مَرَّ بِكَ اَقْطَعُ فَقُلْتَ هٰذَا اَقْطَعُ كَانَ ذٰلِكَ غِيْبَةً —যদি তোমার কাছ দিয়ে হাত পা কাটা কেউ যায় আর তুমি তার দৈহিক অবস্থার ত্রুটি বর্ণনা কর, তবে এও গীবত হবে।

—(তাফসীরে দোররে মনসূর)

সূক্ষ্মতত্ত্ব—১ ঃ

উপরে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির ভারী দেহের কথা আলোচিত হওয়ায় তিনি দস্তরখান ছেড়ে চলে আসেন। এর কারণ, যে মজলিসে কারো গীবত হয়, সেখানে অবস্থান করা বা সে মজলিসে বসে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন— কোথাও নাচের আসর চললে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। —(তাতারখানিয়া হতে রদ্দুল মোহতার)

আমার (গ্রন্থকার) মতে কোন মজলিসে যাবার আগে যদি জানা যায়, সেখানে কারো গীবত শেকায়েত হবে, তা হলে এমন জায়গায় গমন দুরস্ত নয়। যদি জানা যায়, কারো গমনে মানুষজন গীবত পরিত্যাগ করবে, তা হলে তার যাওয়া জরুরী। তথায় গীবত হবে এটা যদি আগে জানা না যায় এবং যাওয়ার পর গীবত শুরু হয়, তা হলে সম্ভব হলে লোকদেরকে নিষেধ করবে। এতে কোন সমস্যা সৃষ্টির আশংকা থাকলে নিজেই চলে আসবে। এও সম্ভব না হলে অন্ততঃ নিজে গীবতে শরীক হবে না।

সূক্ষ্মতত্ত্ব—২ঃ

উপরাল্লিখিত ঘটনাসমূহ হতে জানা গেল, কারো দৈহিক দোষ বর্ণনা করা, কোন মন্দ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এবং কুৎসিত চেহারার অধিকারী হবার কারণে কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বুদ্ধি বিবেকের পরিপন্থী। এ সম্পর্কে দার্শনিক কবি আল্লামা জালুদ্দীন রুমী (রহঃ)-এর উক্তির মর্মকথা হচ্ছে—

—হিন্দুস্তানী, স্কচ, রোমক এবং হাবশী— সবাই কবরে একই রংয়ের হবে। যাতে তোমরা জানতে পার, এ রং রূপ, আকৃতি, এ সবই মহান আল্লাহর দান।

প্রত্যেক আকৃতিই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন, কাউকে পুণ্যকর্মশীল কাউকে পাপাচারী করেছেন। প্রত্যেকের মাঝেই কোন না কোন দোষ রয়েছে। গীবতকারী লক্ষ্য করলে নিজের মাঝেও হাজারো দোষ দেখতে পাবে। হাঁ, কেউ যদি সর্বদোষ হতে মুক্ত পবিত্র হয়, তা হলে অবশ্য তার অপরের গীবত করার অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে জনৈক কবির উক্তির সারমর্ম হচ্ছে—

—হে জ্ঞানী! সৃষ্টিকুলের দোষ প্রকাশ করো না, নিজের দোষের কারণে সৃষ্টিকুল হতে নিঃসম্পর্ক নির্লিপ্ত থাক।

পোশাক পরিচ্ছদের গীবত

দৈহিক গঠন আকৃতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কারো পোশাক পরিচ্ছদের গীবত করা। যেমন— এরূপ বলা, অমুক অত্যন্ত কৃপণ, কৃপণদের মত পোশাক পরিধান করে। অমুকে হারাম পোশাক যেমন— রেশমী কাপড় অথবা দুষ্ট বদমাশ প্রকৃতির লোকদের মত অঙ্গরাখা পরিধান করে, অথবা তার পাজামা টাখনু গিরার নীচে ঝুলে থাকে. অমুক মেয়েলোক এভাবে দোপাট্টা জড়িয়ে থাকে যে, তার সতর খোলা থাকে, অথবা জামা ব্লাউজ এমনভাবে পরিধান করে যে, পেট উদাম থাকে. অথবা অমুক

মেয়েলোক এমনভাবে চলে যে, মানুষ তার সতর দেখতে পায়— এসবই গীবত। নিম্নে পোশাকের গীবত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আলোচনা করা হল।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, অমুক মেয়েলোকের আঁচল খুবই লম্বা। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা আবশ্যক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, থুথু ফেললে আমার মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়। —(আততারগীব ওয়াততারহীব)

উপদেশ বাণী

পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেন, لَوْ قُلْتَ اِنَّ فُلَانًا ثَوْبُهٗ قَصِيْرٌ اَوْ ثَوْبُهٗ طَوِيْلٌ يَكُوْنُ غِيْبَةً —তুমি যদি তুচ্ছ জ্ঞান করে বল, অমুকের কাপড় অত্যন্ত ছোট বা অত্যন্ত বড়, তা হলে এও তার গীবত করা হল।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন ঃ গীবত অধ্যায়)

বংশের গীবত

তুচ্ছ বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি, অমুক বংশ অথবা অমুক শহরের লোকদের বংশধারা ভাল নয়। কেননা, তাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ হীন নীচ বংশীয় ছিল, অথবা তাদের বংশধারা অজ্ঞাত, এতেও গীবত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, لَيْسَ لِاَحَدٍ فَضْلٌ عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا بِالدِّيْنِ اَوْعَمَلٍ صَالِحٍ —দ্বীন এবং নেক আমল ব্যতীত কারো উপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

অতএব, নিজের বংশ গৌরব প্রকাশ এবং অন্যের বংশের দোষ বর্ণনা, হেয় তুচ্ছ সাব্যস্ত করা নিতান্ত নিকৃষ্ট স্বভাব।

—(আশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ ঃ তাহরীমু এহতেকারিন নাস অধ্যায়)

অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত

কারো অভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে এরূপ বলা— সে কাপুরুষ, নিতান্ত দুর্বলচেতা, অত্যন্ত নিদ্রাকাতর, পেটুক, অকর্মা, উঠাবসায়, চালচলনে ভদ্রতা শালীনতা রক্ষা করে চলে না, কোন বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, নিতান্ত বেওকুফ, মেয়েলোকদের পরামর্শে চলে, সে স্ত্রৈণ— স্ত্রীর অনুগমন করে চলে, অথবা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি বলা গীবত।

কারো অভ্যাস আচার-আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে গীবত, এর সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

আরবে দস্তুর ছিল, একজন অন্য জনের সেবা পরিচর্যা করত। একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন— লোকটা খুব বেশী ঘুমায়। অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পাঠান। তিনি খেদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহার্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা দুই জন তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে। তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কি খেলাম? তিনি এরশাদ করলেন, আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়।

— (তাফসীরে দোররে মনসূর — জিয়া মাকদেসীর সূত্রে)

দ্বিতীয় ঘটনা

কোন কোন সাহাবী জনৈক লোক সম্পর্কে বললেন, সে অত্যন্ত দুর্বল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার গীবত করেছ এবং তার গোশত ভক্ষণ করেছ।

তৃতীয় ঘটনা

একবার কোন কোন সাহাবী এক লোকের আলোচনায় বললেন, সে এক আজব মানুষ, কেউ তাকে খাওয়াল তো খেল, কেউ বাহনে আরোহণ করাল তো আরোহণ করল, কিন্তু নিজে কোন প্রকারে উপার্জন করতে পারে না। এ আলোচনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচক

সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রকৃত দোষ প্রকাশ করাও কি গীবত? তিনি এরশাদ করলেন, গীবত হওয়ার জন্য কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনাই যথেষ্ট। —(আততারগীব ওয়াততারহীব)

চতুর্থ ঘটনা

এক সফরে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে কিছু গোশত চেয়ে পাঠান। জবাবে তিনি বলে পাঠালেন, তোমরা কি পরিতৃপ্ত হয়ে মুসলমান ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করনি? তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো তাকে কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, সে দুর্বল, আমাদের সেবা পরিচর্যা করতে পারে না। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এও বলবে না। কারো ন্যূনতম মন্দ বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করবে না।

এ ঘটনা ইমাম তিরমিযী (রঃ) নাওয়াদেরুল উসূল গ্রন্থে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তাফসীরে দোররে মনসূরে উদ্ধৃত করেছেন।

পঞ্চম ঘটনা

এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবেশ লোক এক বালিকার সাথে কৌতুক করেন। লোকেরা এ সম্পর্কে জানতে পেরে দরবেশকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করতে শুরু করে। দরবেশ এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেন, মহা তাজ্জবের কথাই বটে! লোকেদের নিকট কৌতুক তো হারাম আর গীবত হালাল।

ষষ্ঠ ঘটনা

একদিন হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর গীবত করে—তাঁর খাওয়া শোয়ার অবস্থা বর্ণনা করে। তখন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন, وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا — তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। এ আয়াত থেকে গীবত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। —(ইবনে জোরায়জের সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

এবাদতে গীবত

অমুক ভালভাবে নামায আদায় করে না, তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রমযানুল মোবারকের রোযা আদায়ে ত্রুটি করে। অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায আদায় করে— এসব বলা এবাদত সম্পর্কিত গীবত।

এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বলল, আমি আল্লাহর উদ্দেশে অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি। যাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে। আপনি তাঁকে ডাকিয়ে আমার ইনসাফ করুন। রাহমাতুল লিলআলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? তিনি বলতে শুরু করলেন— আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সদকা দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। যাঁর গীবত করা হয়েছে—তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ত্রুটি করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ত্রুটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি খাপ্পা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাহিনী শুনে শত্রুতা পোষণকারী এবং গীবতকারীকে বললেন, উঠ! তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছ এবং গীবত করছ, সম্ভবতঃ পরিণামে সে তোমার থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ তোমার জন্য অসমীচীন। —(এহইয়াউল উলূম ঃ আসবাবুল গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত শেখ সাদী (রঃ) এমন কতিপয় লোকের গীবত করেন যারা তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। বললেন, কতই না ভাল হত, যদি এরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ত। একথা শুনে তাঁর আব্বা বললেন, কতই না ভাল হত যদি তুমি ঘুমিয়ে যেতে এবং এ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে।

গোনাহের গীবত

অমুকে যেনা করেছে, গীবত করেছে, অথবা সে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, অন্তরে সীমাহীন শত্রুতা রাখে, অথবা সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, অমুক মা-বাবাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, অথবা অমুক ব্যক্তি কটুভাষী, অশ্লীলভাষী, অমুক সর্বদা মদ পান করে, অধিকাংশ সময়েই চুরি করে— কারো সম্পর্কে এরূপ বলাও গীবত।

এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তাঁর শরীরের রং কাল হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) বানিয়ে তার তওয়াফ কর, তা হলে আমি তোমার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করব এবং তোমার তওবা কবুল করব। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাবা শরীফ বানানো শেষ হলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) জান্নাত থেকে হাজারে আসওয়াদ এনে উপস্থিত করেন। তখন এর রং অত্যন্ত সাদা ছিল এবং সেটির আলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত। পাথরটির উপর হযরত আদম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়লে তাঁর জান্নাতের আরাম আয়েশের কথা স্মরণ হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন, তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন জান্নাত থেকে আনীত সাদা পাথরটি তাঁকে বলল, হে আদম! আপনি তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে নিজের জন্য অনিষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার গোনাহের কারণে সব বস্তুই আমাকে মন্দ বলেছে। এমনকি জান্নাতী পাথরও যা ইচ্ছা তাই বলল। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি দয়ার্দ্র এবং পাথরের উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি আদম আলাইহিস সালামের কালো রং পাথরকে এবং পাথরের শুভ্রতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দান করেন। ফলে সাদা পাথরটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তার নাম হয় হাজারে আসওয়াদ। আর হযরত হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ আলোকিত হয়ে যায়।

—(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস ঃ আইয়ামু লবীয অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

বনী ইসরাঈলে দুই ব্যক্তি ছিল। একজন সর্বদা এবাদত করত আর অন্যজন সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকত। এতে এবাদতকারী সব সময় গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপমান অপদস্থ করত। একদিন আবেদ পাপাচারীর উপর খাপ্পা হয়ে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ হয়। তিনি আবেদকে জাহান্নামী আর পাপাচারীকে জান্নাতী করে দেন। —(আবু দাউদ—অধ্যায় ঃ আলবিররে ওয়াসসেলাহ)

তৃতীয় ঘটনা

হযরত শেখ সাদী (রঃ) একদিন ওস্তাদের নিকট নিবেদন করলেন, সমবয়সী অমুক আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। ওস্তাদ বললেন, সাদী! তোমার নিকট ঈর্ষা পোষণ হারাম এবং গীবত হালাল! তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ এবং তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণের অভিযোগ করছ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত কেউই মাসুম—নিষ্পাপ নন। অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যদের নিষ্পাপ হওয়ার কোন প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। প্রত্যেকের মাঝেই একটা না একটা দোষ রয়েছে। কারো মাঝে ঈর্ষা রয়েছে তো কারো মাঝে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণের দোষ রয়েছে। কেউ গীবত করে তো অন্য জন মিথ্যা বলে। কেউ চুরি করে তো আরেকজন বিপর্যয় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। কেউ যেনায় অভ্যস্ত, আবার কারো মাঝে দুষ্কৃতিপনা রয়েছে। সারকথা, প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন দোষ রয়েছে, কেউই দোষমুক্ত নয়। অতএব, যেকোন দোষের জন্য কারো গীবত করা নিরর্থক। কেননা, গীবতকারীই বা কবে সব দোষ থেকে পূত পবিত্র হতে পেরেছে। সুতরাং কাউকে কোন গোনাহে জড়িত দেখলে তার হেদায়াতের জন্য এবং নিজের নেক কাজের শক্তি সামর্থ লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোআ করা কর্তব্য। এ না করে গোনাহে লিপ্তকে অপমান অপদস্থ করবে না, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না। বরং আল্লাহ তাআলা যে তোমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তজ্জন্য শোকর করবে। যখনই কারো দোষের কথা মনে জাগবে, তখনই নিজের গোনাহের কথা খেয়াল করবে, এতে অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

হযরত ওমর (রাঃ) এরশাদ করেন—

كَفٰى مِنَ الْغَىِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلٰثٌ يَعِيْبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِىْ بِهٖ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوْبِ النَّاسِ بِهَا لَا يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهٖ وَيُؤْذِىْ جَلِيْسَهٗ فِىْ مَالَا يَعْنِيْهِ

— মোমেনের পথভ্রষ্টতার জন্য তিনটি বিষয়ই যথেষ্ট– (১) নিজে যে কাজ করে সে কাজে অন্যকে দোষী করা, (২) মানুষের দোষ দেখে কিন্তু নিজের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকা, (৩) সঙ্গী সাথী সতীর্থদেরকে নিরর্থক কষ্ট প্রদান করা। —(তাম্বীহুল গাফেলীন ঃ মাযালেম অধ্যায়)

সংশোধনমূলক উপদেশ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফরমান—

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَتَقْسُوا قُلُوْبُكُمْ فَاِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ وَلَا تَنْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِ النَّاسِ كَاَنَّكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى عَبِيْدِ النَّاسِ وَانْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِكُمْ كَاَنَّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ فَاِنَّهَا النَّاسُ مُبْتَلٰى وَمُعَافٰى فَارْحَمُوْا اَهْلَ الْبَلَاءِ وَاحْمَدُوا اللّٰهَ عَلَى الْعَافِيَةِ -

—লোকসকল! তোমরা আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলো না। কেননা, যে বেশী কথা বলে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আলোচনায় সময় নষ্ট করে, তার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং কঠিন অন্তর আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। হে লোকসকল! তোমরা অন্যদের গোনাহের প্রতি দেখো না, যেমন মালিক নিজের চাকর বাকরদেরকে দেখে থাকে। বরং তোমরা নিজেদের গোনাহসমূহ এমনভাবে দেখ, যেন তোমরা সবাই আল্লাহ তাআলার গোলাম। আর মানুষ দুই প্রকার— কাউকে আল্লাহ তাআলা গোনাহে জড়িত করেছেন এবং কাউকে নিরাপদ রেখেছেন। অতএব, কাউকে গোনাহে জড়িত দেখলে তার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হও। তার কল্যাণের জন্য দোআ কর এবং আল্লাহ তাআলা যে তোমাকে গোনাহ থেকে নিরাপদ রেখেছেন তজ্জন্য শোকর কর। এ না করে গোনাহগারকে অপদস্থ করবে না। —(মোআত্তায়ে ইমাম মালেক—অধ্যায় ঃ মা ইয়াকরাহু মিনাল কালাম)

গোনাহের জন্য কাউকে অপমান অপদস্থ করা, তাকে জাহান্নামী ভাবা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিপরীত। বরং গোনাহের কারণে কাউকে লজ্জা দিলে, অপমান অপদস্থ করলে আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হন এবং ঘটনা বিপরীত করে গোনাহগারকে মাফ করে দিয়ে লজ্জাদানকারীকে অপমান করেন।

পঞ্চম ভাগ

এ ভাগের গীবত চার প্রকার—

সরাসরি এবং অনুকরণজনিত গীবত

প্রথমতঃ কারো নাম করে তার মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা, তার গীবত করা; দ্বিতীয়তঃ কারো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করা। যেমন— কেউ খোঁড়া

হলে হাঁটতে তার অনুকরণ করা, অন্ধের পিছনে চোখ বন্ধ করে চলা, কেউ বোবা বা তোতলা হলে তার অনুকরণ করা, কেউ অহংকারবশতঃ সিনা টান করে চললে তার অনুকরণে সিনা টান করে চলা, কেউ কথা বলতে ঘাড় বা হাত হেলাতে অভ্যস্ত হলে নিজেও তার মত করা, এ সবই অনুকরণজনিত গীবত।

অনুকরণজনিত গীবত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— مَا اُحِبُّ اِنِّىْ حَكَيْتُ اَحَدًا وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا — আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করি না, যদিও আমার অনেক কিছু লাভ হয়।

—(তিরমিযী হতে মেশকাত)

এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক মেয়েলোকের অনুকরণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন — مَا يَسُرُّنِىْ اِنِّىْ حَكَيْتُ وَلِىْ كَذَا وَكَذَا —অনেক কিছু লাভ হলেও কারো অনুকরণ আমার নিকট ভাল মনে হয় না। —(এহইয়াউল উলুম—গীবত অধ্যায়)

ইঙ্গিতে গীবত

প্রকাশ্যে অথবা নাম না নিয়ে কারো গীবত করা হল না বটে, কিন্তু এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, অমুকের দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যেমন— এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার নিকট এসেছে, যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে, আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে, সে বা তাদের গীবত করা হল। অথবা বলা হল, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূলতঃ জাহেল মূর্খ আর পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত লোকজন বুঝে যায়, এ ব্যক্তি অমুককে মন্দ বলছে। অথবা বলা— কিছু লোক আছে যারা মসজিদে এতেকাফ করে পরে ভঙ্গ করে ফেলে। আর শ্রোতারা এ লোকদের নাম জানে। অথবা বলা— এক লোক এমন যে, জামা পাগড়ি খুব ভালই পরে, কিন্তু গোপনে গোপনে যেনা করে। আর মানুষ জানে কে জামা পরে আর পাগড়ি বাঁধে। অথবা বলা— কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর তাবেদারী আর মা-বাপের অবাধ্যতা করে, মানুষ জানে একথা বলে অমুককে উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা কালো রংয়ের কেউ পাশ দিয়ে

অতিক্রম করলে বলা — কিছু লোক এমন কালো যেন দেয়াল, আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য চলে যাওয়া ব্যক্তি। অথবা কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে এসে বলা — কিছু লোকের শরীর থেকে কেমন উৎকট দুর্গন্ধ আসে, আর মানুষ বুঝে যায়, এর দ্বারা উক্ত রোগীকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা বলা— কিছু লোকের ঘাম হতে কেমন দুর্গন্ধ আসে, আর উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলে, অমুকের দোষ বলা হচ্ছে। অথবা মাহফিল শেষে লোকজন উঠে গেলে বলা— এমন কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে উপস্থিত সব লোকই ফাসেক পাপাচারী হয়। অথবা কারো আলোচনা আসলে বলা— কিছু লোক খুবই দুষ্কৃতকারী, কৃপণ। সারকথা, উল্লিখিত সব না জানার ভান করে বলা হলেও মানুষ ইঙ্গিতে বুঝে যায়, অমুকের দোষ আলোচিত হচ্ছে, তাই উল্লিখিত সর্বপ্রকার আলোচনাই গীবত।

উপহাসমূলক গীবত

প্রকাশ্যতঃ নির্দিষ্ট কারো আলোচনা করা হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ বুঝে যায়— অমুকের কথা বলা হচ্ছে; এও গীবত। যেমন— কারো আলোচনা আসলে বলা— আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ জানুক অমুক ব্যক্তি গোনাহগার। অথবা বলা— আমি যেনাকার নই। উদ্দেশ্য, মানুষ আলোচিত ব্যক্তিকে যেনাকার বলে বুঝে নিক। অথবা বলা— অহংকার খুবই খারাপ; উদ্দেশ্য, মানুষ বুঝুক আলোচিত ব্যক্তি অহংকারী। অথবা বলা— দাড়ি কাটা নিষিদ্ধ, যাতে মানুষ বুঝে নেয়, অমুক লোক দাড়ি কাটে। অথবা বলা— ফজরের নামায জামাআত ছাড়া আদায় করা গোনাহ, উদ্দেশ্য একথা বুঝানো, আলোচিত ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে না। কারো সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করাও গীবত।

ষষ্ঠ ভাগ

এ ভাগের গীবত পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে মুখে গীবত করা। এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

কয়েক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেল। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে

গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন।

—(তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধান থেকে চলে যাবার পর আরেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আজ গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছ।

—(তিবরানী হতে আত-তারগীব ওয়াততারহীব)

কানের গীবত

কারো গীবত শুনে চুপ থাকা এবং তা প্রতিরোধ না করা কানের গীবত। কেননা, গীবত শুনে চুপ থাকা এবং প্রতিরোধের চেষ্টা না করা যেন নিজেই গীবত করা।

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন—

ترا انکه چشم ودہن داد وگوش - اگرعاقلے در خلافش مکوش

—যে সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَاءٍ فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُمْ

— যখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে— তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও। কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী গণ্য হবে।

—(ইবনে আবিদ্দুনইয়া (রঃ)-এর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

কানের গীবত সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

মায়মূন বিন সিয়াহ নিজের অবস্থার বর্ণনায় বলেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে এক মৃত হাবশীকে এনে কেউ বলছে, হে মায়মূন! তুমি এ হাবশী মৃতকে খাও। আমি কেন মৃত হাবশীকে খাব? সে বলল, তুমি অমুকের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তার গীবত করিনি। এমনকি তার কোন বৈশিষ্ট্যই আমি উল্লেখ করিনি। সে বলল, যদিও তুমি গীবত করনি, তবে শুনেছ। আর গীবত শুনা এবং গীবত করা একই রকম। —(তাফসীরে মাআলেমুত তানযীল)

অন্তরের গীবত

কোন নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ অন্তরের গীবত।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

হাত, নাক অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা মানুষকে অন্যের দোষ বুঝিয়ে দেয়া, যেমন—কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে হাতে তার প্রতি ইশারা করা, নাকে ইঙ্গিত করা, ঠোঁট বাঁকা করা, উদ্দেশ্য মজলিসত্যাগী লোকটি যে ভাল নয় তা মানুষকে বুঝানো, অথবা কারো প্রশংসার মাঝখানে ঘাড় হেলানো, ইত্যাদি সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।

এ সম্পর্কে নিম্নে দুই একটি ঘটনা, কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

জনৈকা রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধানে আগমন করে। আগন্তুক ছিল খর্বাকৃতির। সে চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তুচ্ছার্থ তার দিকে হাতে ইশারা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। —(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজে গমন করে সেখানে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখলেন, আগুনের কাঁচি দ্বারা কিছু লোকের মুখ কাটা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?

তিনি বললেন, এরা সেসব লোক, যারা পার্থিব জগতে যেনায় লিপ্ত হবার জন্য সাজসজ্জা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর একদল লোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তাদের কাছ থেকে দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল! এরা কারা! তিনি বললেন, এরা সেসব মেয়েলোক, দুনিয়ার জীবনে যারা যেনার উদ্দেশে সাজসজ্জা করত। অতঃপর আমি এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম, কিছু পুরুষ এবং মেয়েলোক ঝুলে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, هٰؤُلَاءِ الْهَمَّازُوْنَ اللَّمَّازُوْنَ —এরা সেসব লোক যারা দুনিয়ায় হাত এবং নাক দ্বারা ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দিত। —(আততারগীব ওয়াততারহীব)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, لَا يَحِلُّ الْمُسْلِمُ اَنْ يُشِيْرَ اِلٰى اَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ —মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তার প্রতি ইঙ্গিত করা কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়।

সূক্ষ্মতত্ত্ব

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন— وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ —প্রত্যেক হুমাযা ও লুমাযার জন্য রয়েছে ওয়ায়ল জাহান্নাম।

হুমাযা এবং লুমাযার অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদ মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হাদীসবেত্তা বায়হাকী (রঃ) ইবনে জোরায়জ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হুমাযা দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে চোখ এবং হাতের ইশারায় মানুষকে কষ্ট দেয়। আর লুমাযা হচ্ছে সে, যে মানুষকে মুখে কষ্ট দেয়। তাফসীরে দোররে মনসূরে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) এ বর্ণনাই উদ্ধৃত করেছেন। বাগাভী (রঃ) তাফসীর গ্রন্থ মা'আলেমুত তানযীলে উদ্ধৃত করেছেন, হুমাযা বলে সে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করা হয়েছে, যে মুখে মানুষকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করে। আর লুমাযা সে, যে চোখে ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দেয়। সোলায়মান জুমাল তাফসীরে জালালাইনের টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, হুমাযা সে, যে নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকে মুখে কষ্ট দেয়, আর লুমাযা সে, যে ভ্রূ দ্বারা কারো প্রতি ইঙ্গিত করে।

কলম দ্বারা গীবত

কারো দোষত্রুটি, নিন্দাবাদ চিঠিপত্রে লেখা, পত্রিকায় প্রকাশ করা, মুদ্রিত করা, অথবা স্বরচিত গ্রন্থে হেয় তুচ্ছ করার উদ্দেশে সমসাময়িকদের নিন্দাবাদ করা, দোষ বর্ণনা ইত্যাদি সবই কলমের গীবত।

তৃতীয় শাখা

গীবতের বৈধ প্রকারসমূহ

গীবতের যেসব প্রকার বৈধ; বরং কোন কোন প্রকারে সওয়াব রয়েছে এবং শরীঅত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম যেসব প্রকারের অনুমতি দিয়েছেন, এখন সে সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছে।

হাদীসবেত্তা ইমাম নববী (রঃ)' মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে, ইমাম গাযালী (রঃ) এহইয়াউল উলূম ও কিমিয়ায়ে সাআদাত গ্রন্থে, সফূরী নুযহাতুল মাজালেসে, বলখী (রঃ) আইনুল এলেম গ্রন্থে গীবতের ছয় প্রকার বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন এবং মাতালেবুল মোমেনীন গ্রন্থেও অনুরূপ বলা হয়েছে। ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) দোররে মোখতারের পার্শ্বটীকা রদ্দুল মোহতারে উল্লিখিত ছয় প্রকারের সাথে আরও চার প্রকার সংযোজন করে দশ প্রকার বৈধ লেখেছেন। আমি (গ্রন্থকার) এ দশ প্রকারের সাথে আরও তিন প্রকার যোগ করে সর্বমোট তের প্রকার গীবত বৈধ বলে লেখেছি এবং প্রত্যেক প্রকারের বৈধতার কারণও উল্লেখ করেছি।

রাজদরবারে নিম্নস্থদের জুলুমের অভিযোগ করে বিচার প্রার্থনা

কোন বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী বা পদস্থ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কারো উপর জুলুম করলে মজলুম নিজের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দায়ের করা বৈধ। কেননা, শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের না করলে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে হয়ত অত্যাচারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হতে পারে, এতে সবাই তার জুলুম থেকে রক্ষা পাবে। বর্ণিত সব উপকারিতার কারণে এ প্রকারের গীবত বৈধ।

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন, لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ —কারো দুষ্কৃতি প্রকাশ করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, তবে সে ব্যক্তি যে অত্যাচারিত।

অর্থাৎ, কেউ অত্যাচারিত হলে তা প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই। এ সম্পর্কে নিম্নে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু লোকের নিকট মেহমানদারী যাচ্ঞা করে, কিন্তু তারা তা করেনি। এতে মেহমানদারী আকাঙ্ক্ষী যাদের নিকট মেহমানদারী কামনা করেছিল, তাদের দুর্নাম রটাতে শুরু করে এবং প্রকাশ্যে তাদের নিন্দাবাদ করতে থাকে। এতে সাহাবায়ে কেরাম তার উপর রুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ আয়াত নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীর গীবত করার অনুমতি প্রদান করেন। —(তাফসীরে মাযহারী)

দ্বিতীয় ঘটনা

কেন্দা গোত্রের এক ব্যক্তি এবং হাযরামাউত শহরের দুই অধিবাসীর মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। হাযরামাউতের অধিবাসীদ্বয় কেন্দা বংশীয় লোকটির পিতার নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে অভিযোগ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পিতা আমার অমুক ভূমিখণ্ড জবরদখল করে নিয়েছে। আপনি আমার ভূমিখণ্ড নিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীঅত মোতাবেক আলোচ্য মোকদ্দমার ফয়সালা করে দেন। —(আবু দাউদ– দাআবী অধ্যায়)

উপদেশ

শোবা (রঃ) বলেন, اَلشِّكَايَةُ وَالتَّحْذِيْرُ لَيْسَا مِنَ الْغِيْبَةِ — জালেম সম্পর্কে অভিযোগ করা এবং মানুষকে কোন জালেম, ফাসেক পাপাচারীর অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার গীবত করা গীবত নয়।

—(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

এটি গীবতের সে ছয় প্রকারের একটি, যা সম্পর্কে ইমাম গাযালী, সফুরী, বলখী এবং মাতালেবুল মোমেনীন গ্রন্থ প্রণেতা ঐকমত্য পোষণ করেন।

সূক্ষ্মতত্ত্ব

আয়াতের মধ্যকার لَا يُحِبُّ শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, কেউ কারো পাপাচার প্রকাশ করলে আল্লাহ তাআলা তার উপর আযাব নাযিল করবেন। আর جَهْرًا بِالسُّوْٓءِ-এর মর্মার্থ হচ্ছে দোআ। ইমাম রাযী (রঃ) তাফসীরে কবীরে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে উল্লিখিত রূপই উদ্ধৃত করেছেন। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ হল, বদ দোআ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না-তবে অত্যাচারিতের বদ দোআ করা বৈধ। অথবা جَهْرَ بِالسُّوْءِ-এর অর্থ দোষ বর্ণনা করা, যা ইমাম বাগাভী (রঃ) উল্লেখ করেছেন। অথবা উভয় অর্থই উদ্দেশ্য, যা তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, যে কারো দোষ প্রকাশ করবে অথবা কারো জন্য বদ দোআ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে আযাব দেবেন, কিন্তু অত্যাচারীর জন্য বদ দোআ করা, তার গীবত করা বৈধ। যেমন— বলা, অমুক আমার মাল চুরি করেছে, বলপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিয়েছে, আমার আমানতে খেয়ানত করেছে। এভাবে শাসকের নিকট প্রত্যেক জুলুম অত্যাচার সম্পর্কে অভিযোগ করা বৈধ।

দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশে গীবত

যদি কেউ কোন দোষ অথবা গোনাহে জড়িত থাকে, তার এ দোষ বা গোনাহের কথা এমন ব্যক্তিকে জানানো, যিনি তাকে নিষেধ করবেন, সংশোধন করবেন ও নসীহত করবেন, এ প্রকারের গীবত বৈধ। কেননা, এ গীবতে গীবতকৃতের উপকার হয়, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন— কারো মাঝে কোন দোষ থাকলে তার পিতাকে বা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অবহিত করা, অথবা বিচারক ঘুষ নিলে তার সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, যাতে পিতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষ ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককে পদচ্যুত বা সাবধান করবেন, এতে সকলের উপকার হবে।

—(মাতালেবুল মোমেনীন, আইনুল এলেম, সীরাতে আহমদিয়া, রদ্দুল মোহতার, তানবীরুল আবসার, এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস শরহে মুসলিম লিইমাম নববী)

হাদীস শরীফে আছে, اَلْمُسْتَمِعُ شَرِيْكُ الْمُغْتَابِيْنَ —গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীর গোনাহে অংশীদার।— (খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

আবুল লাহম (রাঃ) নিজের গোলাম ওমায়র (রাঃ)-কে গোশত ভুনা করার নির্দেশ দেন। তিনি চলে গেলে এক মিসকীন আসে এবং ওমায়র (রাঃ) মনিবের অনুমতি ছাড়াই মিসকীনকে গোশত দিয়ে দেন। হযরত আবুল লাহম (রাঃ) ফিরে এসে জানতে.পেরে ওমায়র (রাঃ)-কে প্রহার করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ঘটনা বর্ণনাপূর্বক মনিব সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করেন। উদ্দেশ্য, তিনি মনিব আবুল লাহম (রাঃ)-কে হিতোপদেশ দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডেকে আনান এবং গোলামকে প্রহার করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে সে মিসকীনকে গোশত দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওহে আবুল লাহম! তোমার গোলাম যা সদকা করবে তার অর্ধেক সওয়াব তুমি পাবে। তাই তাকে মারধরে বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করো না।

—(মুসলিম ঃ সদকা অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুফাবাসী অনেক ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে। অভিযোগসমূহের মধ্যে এক অভিযোগ এও ছিল, হযরত সাদ (রাঃ) ভালভাবে নামায পড়েন না এবং নামাযের সূরা কেরাআত ভালভাবে আদায় করেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ অভিযোগের ভিত্তিতে হযরত সাদ (রাঃ)-কে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আম্মার (রাঃ)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভিযোগকারীদেরকে কিছুই বললেন না। এর পর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাদ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বললেন, হে সাদ! এসব লোক বলছে, তুমি ভালভাবে নামায পড় না। জবাবে হযরত সাদ (রাঃ) নিবেদন করলেন, যখন যোহর, আসর ও এশার নামায পড়ি, তখন প্রথম দুই রাকআতে কেরাআত লম্বা করি এবং শেষ রাকআতে কেরাআত কম করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নামায পড়তেন, আমিও সেভাবেই পড়ি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সা'দ তোমার আমার উপর এ আস্থাই ছিল, তুমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতই নামায আদায় করবে।

—(বোখারী– অধ্যায় ঃ কেরাআতুল ইমামি ওয়াল মামূম)

এ থেকে জানা গেল, কাউকে দোষমুক্ত করার সদিচ্ছায় তার সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কারো কাছে অভিযোগ করা বৈধ। তা না হলে কুফাবাসী হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করতেন না। আর হযরত ওমর (রাঃ)-ও এর প্রতি কান দিতেন না। কেননা, গীবত করা আর শুনা সমঅপরাধ।

তৃতীয় ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর এক স্ত্রী ছিল। যে তাঁর খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এ পুত্রবধূর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সব সময় ছেলেকে বলতেন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে। হযরত ওমর (রাঃ) যতই বলছিলেন, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার কথা শুনছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে পুত্র সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, ছেলে আমার কথা শুনছে না, আমার ইচ্ছার বিপরীত কাজ করে চলেছে। এ অভিযোগ দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বাপের কথা মেনে নিতে হিতোপদেশ প্রদান করবেন। এ অভিযোগ শ্রবণান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি পিতার আনুগত্য কর এবং স্ত্রীকে তালাক দাও।

—(আবু দাউদ–বেররুল ওয়ালেদাইন অধ্যায়)

চতুর্থ ঘটনা

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর সমকালে এক লোক সব সময় গোনাহে লিপ্ত থাকত। তার মা তাকে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে বিভিন্নভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত থাকত না। লোকটির মা হযরত হাসান বসরী (রঃ) সমীপে গমনাগমন করতেন এবং ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ করতেন যেন হযরত হাসান বসরী (রঃ) তার ছেলেকে হিতোপদেশ প্রদান করেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ মহিলার অভিযোগ শুনেও চুপ করে থাকতেন। এমনকি মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলে লোকটির মনোজগতে ভীতি সঞ্চারিত হয়। সে মাকে বলল, যদি হযরত হাসান (রঃ)-কে ডাকতেন, তা হলে তিনি আমাকে তওবা শিখিয়ে দেবেন এবং আল্লাহর দরবার থেকে ক্ষমা করাবেন। লোকটির মা হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর খেদমতে এসে ছেলের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। তিনি যেহেতু লোকটির উপর খুব বেশী অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তার কাছে যাননি। সে হযরত হাসান (রঃ)-এর আগমন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে

মাকে বলল, মা! প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেলে গলায় রশি বেঁধে আমাকে হেঁচড়ে ফেরাবে; আমার কবর ঘরে দিবে। কেননা, আমি খুবই খারাপ মানুষ। মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। যদি আমাকে কবরস্তানে অন্যান্য মুর্দারের সাথে দাফন করা হয়, তা হলে আমার কারণে তারাও কষ্ট পাবে।

অবশেষে তার প্রাণবায়ু উড়ে গেলে মা তার অন্তিম ইচ্ছা পালনের ইচ্ছা করেন। হঠাৎ করে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল, এ লোক আল্লাহর ওলী। আল্লাহ তাআলা তার কাজ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তুমি তার সাথে কথিত রূপ কঠোরতা করো না। তার মা অদৃশ্য আওয়াজ শুনে গলা থেকে রশি খুলে তার অন্তিম ইচ্ছামাফিক ঘরেই কবর দেয়। কাফন দাফন সমাপ্ত হওয়া মাত্র হযরত হাসান বসরী এসে মৃতের মাকে বললেন, আমি এ মাত্র আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে বলছেন, হাসান! তুমি তাকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করেছ, তার কাছে যাওনি। আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছি। —(নুযহাতুল মাজালেস)

পঞ্চম ঘটনা— সালামের জবাব সম্পর্কিত

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-কে সালাম দেন, কিন্তু তিনি সালামের জবাব দেননি। হযরত ওমর (রাঃ) এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে বললেন, আপনি তাকে নসীহত করবেন এবং সালামের জবাব দেয়ার তাকিদ করবেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-কে নসীহত করেন।

হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) আইনুল এলেমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

এ থেকে জানা গেল, সালামের জবাব দেয়া জরুরী। তা না হলে সালামের জবাব না দেয়ায় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করতেন না এবং একে মন্দ ব্যাপার বলেও মনে করতেন না। এ কারণে মাসআলা হল, সালাম দেয়া সুন্নতে মোআক্কাদা আর জবাবদান ফরযে কেফায়া। অনেক লোকের মধ্য থেকে একজনও সালামের জবাব দিলে সকলের উপর থেকে ফরযের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ ঘটনা

শাম দেশ থেকে স্থানীয় গভর্নর হযরত ওমর (রাঃ)-কে লেখলেন, এখানে আবু জন্দল নামে এক ব্যক্তি সব সময় মদ্য পান করে। এ দ্বারা

গভর্নরের উদ্দেশ্য; হযরত ওমর (রাঃ) যেন আবু জন্দলকে নসীহত করেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ অভিযোগ শুনে এক চিঠিতে আবু জন্দলকে অত্যন্ত ভয়ভীতি দেখান, ভর্ৎসনা তিরস্কার করেন এবং এ আয়াত লেখেন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ-

— রহমানুর রহীম আল্লাহর নামে। হা-মী-ম (এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না)। এ কিতাব (কোরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত, যিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী, সর্ববিষয়ে অবহিত, গোনাহ মাফকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন আযাবদাতা এবং ক্ষমতাধিকারী—

আবু জন্দল হযরত ওমর (রাঃ)-এর চিঠিতে উক্ত আয়াত পড়ে মনে মনে খুবই লজ্জিত হয় এবং মদ্যপান থেকে তওবা করে।

— (এহইয়াউল উলূম, আলআযারুল মোরাখ্‌খাসাহ লিলগীবত অধ্যায়)

সপ্তম ঘটনা—বিলাপের নিষিদ্ধতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়দ বিন হারেসা, জাফর বিন আবী তালেব এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ অবহিত হয়ে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন। তিনি চিন্তিত মনে মসজিদে বসে ছিলেন। এ সময় এক লোক এসে হযরত জাফর (রাঃ)-এর পরিবারের মহিলাদের দোষ বর্ণনা করে বললেন, তারা সবাই বিলাপ করছে। আপনি তাদেরকে নিষেধ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযোগকারীকেই বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ কর। সে আবার এসে বলল, মহিলারা আমার কথা শুনছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি আবার গিয়ে নিষেধ কর। তৃতীয় বার ফিরে এসেও সে একই অভিযোগ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে মহিলারা যদি বলা কওয়া না শুনে, তবে তাদের মুখে মাটি পুরে দাও।

— (বোখারী—জানায়েয অধ্যায়)

অষ্টম ঘটনা— আগে সালাম দেয়ার ফযীলত

হযরত আলী (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখনই হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন, তাঁকে আগে সালাম দিতেন। একদিন

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত আগে সালাম করেননি। কেউ এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করে বললেন, সব সময় সাক্ষাতে আলী (রাঃ) আগে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সালাম দেন। কিন্তু আজ তাঁর সাথে সাক্ষাতে আগে সালাম দেননি; বরং আবু বকর (রাঃ) সালাম দিলে তিনি সে সালামের জবাব দেন। এ অভিযোগ শুনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে এনে প্রতিদিনকার মত সাক্ষাতে আগে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সালাম না দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে হযরত আলী (রাঃ) নিবেদন করলেন, আজ আমি স্বপ্নে এক বাগিচা দেখতে পেয়েছি। মানুষজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এ বাগিচা কার জন্য? একজন বলল, এ বাগিচা সেই লাভ করবে যে আগে কাউকে সালাম করবে। তাই আমি আজ আবু বকর (রাঃ)-কে আগে সালাম দেইনি, যাতে তিনি আগে সালাম করে স্বপ্নে দৃষ্ট বাগিচা লাভের যোগ্য হতে পারেন।

—(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস— সালাম অধ্যায়)

নবম ঘটনা—ইমামের দীর্ঘ কেরাআত পাঠের নিষিদ্ধতা

হযরত মোআয (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন নামাযে ইমামত করতেন তখন বড় সূরা তেলাওয়াত করতেন। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে হযরত মোআয (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, তিনি নামাযে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেন। এতে মোক্তাদীদের খুবই কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযোগ শুনে হযরত মোআয (রাঃ)-কে নসীহত করলেন— হে মোআয! তুমি সঙ্কট সৃষ্টিকারী! তুমি মানুষকে সংকটে ফেল! নামাযে সূরা ওয়াল্লাইল এবং এবং সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা'র উপরই পরিতৃপ্ত হও। দীর্ঘ কেরাআত তেলাওয়াত করো না। — (আবু দাউদ— আদেল্লা অধ্যায়)

দশম ঘটনা

শামবাসী মদের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে দেয়। এমনকি তারা মদ হালাল হওয়ার ফতোয়াই দিয়ে বসে। তারা দলীল হিসাবে এ আয়াত উপস্থাপন করে— لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا —যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে, খাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন গোনাহ নেই, যা ইচ্ছা খেতে পারে।

এ সময় ইয়াযীদ বিন আবী সুফিয়ান শাম দেশে গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এসব লোক সম্পর্কে অভিযোগ লেখে পাঠান। গভর্নরের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে ডেকে আনেন এবং তাদের ব্যাপারে কি কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তা নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করেন। সাহাবায়ে কেরাম ওমর (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন, আপনি তাদেরকে তওবা করতে বলুন। যদি তারা তওবা করে, তা হলে মদ্য পানের শাস্তি আশি কোড়া মারার নির্দেশ জারি করুন। যদি তওবা করতে অসম্মত হয় তা হলে তাদেরকে হত্যা করুন। অতএব, হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশে তারা মদ্য হালাল হওয়ার বিশ্বাস হতে তারা তওবা করে। —(তাম্বীহুল গাফেলীন—অধ্যায় ঃ খামর)

একাদশ অধ্যায়

শাম দেশে হযরত ওমর (রাঃ)-এর এক বন্ধু ছিলেন। সেখানকার এক লোক হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এলে তিনি তাকে বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আগন্তুক বললেন, আপনার বন্ধু কবীরা গোনাহে লিপ্ত। এমনকি সে মদে চুর হয়ে থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) বন্ধুর অবস্থা শুনে তাকে এক পত্র লেখে ভয় ভীতি প্রদর্শন করেন। উক্ত পত্রে তিনি حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الخ আয়াতও উল্লেখ করেন। এ পত্র পাঠে তাঁর শামবাসী বন্ধু খুব কান্নাকাটি করেন এবং গোনাহ হতে তওবা করেন।

—(এহইয়াউল উলূম—হুকুকুস সোহবত অধ্যায়)

দ্বাদশ ঘটনা

এক লোক ইবনে সিরীন (রঃ)-এর সম্মুখে হাজ্জাজকে মন্দ বললে তিনি সে লোকের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন। তার এ গীবতের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কেননা, ইবনে সিরীন হাজ্জাজকে নসীহত উপদেশ করতে সমর্থ ছিলেন না। সুতরাং সে লোক কর্তৃক হাজ্জাজের গীবত ছিল নিরর্থক।

লজ্জা সৃষ্টির উদ্দেশে গীবত

আমার (গ্রন্থকার) মতে কেউ কোন অন্যায়ে লিপ্ত থাকলে এ উদ্দেশে কারো সামনে তার দোষ বর্ণনা করা—যখন সে শুনবে, অমুক আমার অন্যায় সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, তখন সে লজ্জায় পড়ে নিজে নিজেই অন্যায় পরিত্যাগ করবে। এরূপ গীবত বা দোষ বর্ণনা বৈধ। নিম্নোদ্ধৃত ঘটনা থেকে এরূপ গীবতের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজের প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ করে। তিনি অভিযোগকারীকে ধৈর্যাবলম্বনের নির্দেশ দেন। সে পুনরায় অভিযোগ করলে এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দেন। সে তৃতীয় বারও প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। যখন অন্যান্য প্রতিবেশী এ দেখবে, তখন তোমাকে কষ্টদানকারী নিজেই লজ্জিত হয়ে অন্যায় আচরণ থেকে বিরত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শ মোতাবেক তিনি ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দেন। সে পথ দিয়ে যেই অতিক্রম করত সেই জিজ্ঞেস করত, তুমি এসব রাস্তায় ফেলে দিলে কেন? জবাবে তিনি বলতেন, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তাই আমি ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র বের করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছি। কষ্টদানকারী প্রতিবেশীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তার লজ্জা আসে। তিনি নিজে এসে অপরাধ মাফ করিয়ে সব আসবাবপত্র নিজের ঘরে নিয়ে যান এবং ভবিষ্যতে আর প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেন না বলে ওয়াদা করেন। —(এহইয়াউল উলূম—হুকুকুল জাওয়ার অধ্যায়)

ফতোয়া জানার উদ্দেশে গীবত

মাসআলা জানার উদ্দেশে কোন আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলার ধরন প্রকৃতি বলতে কারো দোষ বর্ণনা করায় ক্ষতি নেই। যেমন— কোন আলেম বা মুফতীর নিকট বলা— অমুক আমাকে প্রয়োজনীয় খরচপাতি দেয় না। আমার আব্বা মারা গেছেন, অমুক আমার অভিভাবক। সে যাবতীয় ধন-সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আমাকে কিছুই দেয় না। অথবা অমুক ব্যক্তি জমিন বা বাড়ী বিক্রি করেছে, আমি তার প্রতিবেশী। আমি চাওয়া সত্ত্বেও বিক্রীত জমিন বা বাড়ী আমাকে দিচ্ছে না। অতএব, এ অবস্থায় আমি ফতোয়া বা মাসআলা জানতে চাই। এরূপ বলায় গীবত হবে না।

—(এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস, সীরাতে আহমদিয়া, মাতালেবুল মোমেনীন, শরহে মুসলিম লিইমাম নববী, রদ্দুল মোহতার হাশিয়া দোররে মোখতার)

নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা লেখা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে আবু সুফিয়ানের গীবত করে বললেন, সে কৃপণ মানুষ। আমাকে প্রয়োজনীয় খরচপাতি প্রদান করে না। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে এরশাদ করলেন, প্রয়োজনীয় খরচপাতি না দিলে অজান্তে তার সম্পদ থেকে নিয়ে নেবে।

—(বোখারী শরীফ—নাফাকাত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে এসে নিবেদন করেন, স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। এ সম্পর্কে আমি মাসআলা জানতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমিও তাকে চড় মেরে বদলা নিয়ে নাও। তক্ষুণি আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন— اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ الخ —পুরুষ মেয়েদের উপর মর্যাদাশীল; সুতরাং তাদের উপর কৃর্তত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে মেয়েদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আর স্বামী বিয়েতে তার সম্পদ ব্যয় করেছে।

—(ইবনে আবী হাতেম (রঃ)-এর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

তৃতীয় ঘটনা

কিছু লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, আমরা হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে বের হই। যাতুস সাফাহতে উপনীত হলে আমাদের এক সঙ্গী মৃত্যুবরণ করে। তাকে দাফন করতে উদ্যত হলে দেখতে পাই, তার কবরের নিকট বিরাট এক সাপ বসে রয়েছে। আমরা সে কবর ছেড়ে অন্যত্র কবর খুঁড়ি। সেখানেও আমরা সাপটি দেখতে পাই। তৃতীয় এক জায়গায় কবর খুঁড়লে সেখানেও একই অবস্থা। এখন আমরা তাকে কোথায় দাফন করব? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ধারণা করলেন, এ সাপ মৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। তিনি মৃতের সঙ্গীদেরকে বললেন, এ সাপ আল্লাহ তাআলার তরফ হতেই মৃতের উপর নিয়োজিত হয়েছে। তোমরা সারা দুনিয়া খুঁড়লেও সর্বত্রই এটি দেখতে পাবে। এখন তোমাদের করণীয় হচ্ছে, তকে কোন কবরে দাফন করে তার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য দোআ করা।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—আযাবুল কবর অধ্যায়)

চতুর্থ ঘটনা

হযরত ওয়ায়মের (রাঃ)-এর স্ত্রীর উপর যেনার সন্দেহ হয়। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু স্ত্রীর গীবত না করে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে যেনারত অবস্থায় দেখে তবে তার কি করণীয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝে ফেললেন, এটা ওয়ায়মেরের স্ত্রীরই ঘটনা। তিনি বললেন, ওয়ায়মের! এ ধরনের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা লেআনের নির্দেশ দিয়েছেন (স্বামী স্ত্রী কসম করে একে অন্যের প্রতি লানত করবে, শরীঅতের পরিভাষায় একে লেআন বলে)। তুমি স্ত্রীকে হাযির করে লেআন করে নাও। সুতরাং তিনি স্ত্রীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে হাযির হন এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক স্বামী স্ত্রী উভয়ে লেআন করেন।

—(মোআত্তায়ে ইমাম মালেক— লেআন অধ্যায়)

প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়ার উদ্দেশে গীবত

আমার (গ্রন্থকার) মতে, প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশে কারো দোষ বর্ণনা করা, তার দুষ্কর্ম প্রকাশ করা বৈধ। যেমন— সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে অন্যদের দোষ বর্ণনা করতেন। কখনও তাদের দুষ্কর্মের কথাও প্রকাশ করতেন। কিন্তু কোন মুসলমানকে অপমান অপদস্থ করা তাঁদের উদ্দেশ্য হত না। বরং উদ্দেশ্য হত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা শুনে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়ে অবহিত করবেন।

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একদিন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এক মেয়েলোকের আলোচনা করে বললেন, সে অত্যন্ত কৃপণ। এ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তার মাঝে কৃপণতার বৈশিষ্ট্য থাকলে সে জাহান্নামী।

—(এহইয়াউল উলূম—গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর কাছ দিয়ে এক জানাযা অতিক্রম করে। তাঁরা তার প্রশংসা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসাবাদ শুনে এরশাদ করলেন—وَجَبَتْ— ওয়াজিব হয়ে গেছে। এর কিছুক্ষণ পর আরেক জানাযা অতিক্রম করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তার নিন্দাবাদ করেন। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন وَجَبَتْ—ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি দুই বারই —وَجَبَتْ— ওয়াজিব হয়ে গেছে শব্দ উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু এর মর্মার্থ বলেননি। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা প্রথম মৃতের প্রশংসা করেছ,তার উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় মৃতের নিন্দাবাদ করেছ, তার উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। কেননা, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত সাক্ষী। তাই যার প্রশংসা করবে, এতে বুঝতে হবে সে জান্নাতী। আর যার নিন্দাবাদ প্রকাশ করবে, সে জাহান্নামী।

—(ইবনে মাজা—জানায়েয অধ্যায়)

সূক্ষ্মতত্ত্ব

এখানে প্রশ্ন জাগে, মৃতের গীবত হারাম। কেননা, কারো মৃত্যুর পর জানা যায় না, সে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত না অভিশপ্ত। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কিভাবে মৃতের গীবত করলেন? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বা কেন এ গীবত শুনে নীরবতা অবলম্বন করলেন? এ সন্দেহের নিরসনে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে।

জামেয়ে সগীর ফী হাদীসিল বাশীরিন নাযীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থে মোহাদ্দেস আল্লামা আযীযী (রঃ) লেখেন— আলোচ্য সন্দেহের যথার্থ জবাব হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে মৃতের নিন্দাবাদ করেছেন, জীবিতকালে সে ফাসেক পাপাচারীদের দলভুক্ত ছিল। তাই মৃত্যুর পরে সাহাবায়ে কেরাম তার গীবত করেছেন। কেননা, মৃত্যুর পরেও পাপাচারীর গীবত জায়েয।

আমার (গ্রন্থকার) মতে, দুই কারণে আল্লামা আযীযী (রঃ)-এর অভিমতের যথার্থতা সম্পর্কে কথা থেকে যায়। প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরাম যে মৃতের নিন্দাবাদ করেছেন, তার ফাসেক পাপাচারী হওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণিত

বিষয় নয়। তাই এ জবাব দৃঢ় প্রত্যয়ের মর্যাদা পেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জীবতকালে পাপাচারী আর আল্লাহভীরু যাই থাকুক, কিন্তু মৃত্যুর পরে সকলের গীবতই হারাম। তবে হাঁ, মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য কারো মৃত্যুর পরও তার পাপাচারজনিত দোষ বর্ণনা করা, এ পাপাচারের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করা বৈধ। আর যে মৃতের নিন্দাবাদের কথা আলোচিত হয়েছে, এ দ্বারা কাউকে ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং এ গীবত কি করে বৈধতা পেল?

আমার মতে, এ নিন্দাবাদ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের মৃতকে অপমান অপদস্থ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে কিছু উপদেশপূর্ণ উক্তি করবেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের মৃত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ হয়েছে।

তৃতীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক মহিলা খুব নামায পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি এরশাদ করলেন, সে মহিলা জাহান্নামী। এর পর সে লোক নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক মহিলা সব ধরনের এবাদতই করে এবং প্রতিবেশীদেরকেও কষ্ট দেয় না, তিনি এরশাদ করলেন, সে জান্নাতী।

—(মেশকাত—আশাশাফকাতু আলাল খালক অধ্যায়)

সূক্ষ্মতত্ত্ব

কারো কারো মতে, দ্বীনী বিষয়ে কোন লোকের গীবত এবং দোষ বর্ণনায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)ও অনেকের আমল সম্পর্কে গীবত করেছেন এবং তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, দ্বীনী বিষয়েও কারো উপকার সাধনের উদ্দেশে গীবত করা যেতে পারে। অন্যথায় শুধু শুধু কারো গীবত বৈধ নয়।

প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত

যে প্রকাশ্যে গোনাহ করে, যেমন— নামায পড়ে না, অথবা যেনা করে, মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করে, অথবা রোযা রাখে না, এরূপ ব্যক্তিকে

হেয় করার, অপমান অপদস্থ করার উদ্দেশে গীবত করা বৈধ। তাই আল্লাহভীরু আলেম সমাজ জালেম শাসকদের গীবত করতেন। সম্মুখে উল্লিখিত অনেক ঘটনা থেকে তা জানা যাবে।

—(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস, রদ্দুল মোহতার, শরহে মুসলিম লিন্নববী, সীরাতে আহমদিয়া, তান্বীহুল গাফেলীন।)

উপদেশবাণী

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন— ثَلٰثَةٌ لَا غِيْبَةَ لَهُمْ صَاحِبُ الْهَوٰى وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهٖ وَالْاِمَامُ الْجَائِرُ-

—তিন ব্যক্তির গীবত নেই। অর্থাৎ, তাদের গীবত বৈধ— (১) কুপ্রবৃত্তির অনুসারী, (২) বেদআতী- প্রকাশ্যে পাপাচারী, (৩) অত্যাচারী শাসক।

ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) বলেন—

اَلْغِيْبَةُ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ فِيْ وَجْهٍ هِيَ كُفْرٌ وَهُوَ اَنْ يَغْتَابَ الْمُسْلِمَ فَقِيْلَ لَهٗ لَا تَغْتَبْ فَيَقُوْلُ لَيْسَ هٰذَا الْغِيْبَةُ وَاَنَا صَادِقٌ فِيْ ذٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَمَنْ اِسْتَحَلَّ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ فَقَدْ كَفَرَ اَمَّا الْوَجْهُ الَّذِيْ هُوَ نِفَاقٌ وَهُوَ اَنْ يَغْتَابَ اِنْسَانًا فَلَا يُسَمِّيْهِ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ اَنَّهٗ يُرِيْدُ بِهٖ فُلَانًا فَهُوَ يَغْتَابُهٗ وَيَرٰى فِيْ نَفْسِهٖ اَنَّهٗ مُتَوَرِّعٌ وَاَمَّا الْوَجْهُ الَّذِيْ هُوَ عَاصٍ فَهُوَ اَنْ يَغْتَابَ اِنْسَانًا وَيُسَمِّيْهِ وَيَعْلَمُ اَنَّهَا مَعْصِيَةٌ فَهُوَ عَاصٍ وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالرَّابِعُ اَنْ يَغْتَابَ فَاسِقًا مُعْلِنًا بِفِسْقِهٖ اَوْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَهُوَ مَاجُوْرٌ لِاَنَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ مِنْهُ اِذَا عَرَفُوْا حَالَهٗ-

— গীবত চার প্রকার। (১) যখন কেউ গীবত করল, তখন তাকে বলা হল, গীবত করো না। তখন সে বলল, আমি গীবত করছি না, যথার্থ দোষ বর্ণনা করছি। এ ব্যাপারে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কেননা, সে আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয়কে হালাল জ্ঞান করে। আর আল্লাহর হারামকৃত বিষয় হালাল জ্ঞান করা কুফরী।

(২) কেউ কারো গীবত করল, কিন্তু নাম বলল না, অথচ শ্রোতারা বুঝে ফেলে, সে অমুকের গীবত করছে, এ গীবতকারী মোনাফেক। কেননা, প্রকাশ্যতঃ সে গীবত থেকে আত্মরক্ষা করছে, গীবতকৃতের নাম বলছে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে গীবতে লিপ্ত। (৩) কারো নাম বলে গীবত করা এবং গীবতকারী এর অপকৃষ্টতা অনিষ্ট সম্পর্কেও অবহিত, এ গীবতকারী গোনাহগার এবং তার তওবা করা ওয়াজিব। (৪) কোন প্রকাশ্য ফাসেক পাপাচারীর গীবত করা— এ গীবতকারী বিনিময় প্রাপ্ত হবে। কেননা, মানুষ এ গীবত শুনে ফাসেক পাপাচারী থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে।

সূক্ষ্মতত্ত্ব

আমার (গ্রন্থকার) মতে, ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) প্রকাশ্যে পাপাচারীর গীবত বৈধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যে লেখেছেন— ফাসেকের গীবত করায় মানুষ তার সম্পর্কে ভয় করবে এবং তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবে, এটা পাপাচারীর গীবত বৈধ হওয়ার পূর্ণ কারণ নয়। কেননা, এমন প্রকাশ্য ফাসেক পাপাচারীর গীবতও বৈধ, যার অবস্থা সবাই অবহিত এবং তাকে ভয় করে চলে। অথচ এ গীবতে সে উপকারিতা নেই, যে উদ্দেশে একে বৈধতা দেয়া হয়েছে। বরং ফাসেক পাপাচারীর গীবত বৈধ হবার দুইটি কারণ : (১) গীবতের ফলে পাপাচারী তার পাপাচার হতে বিরত হবে। সে যখন শুনবে, মানুষ প্রকাশ্য জনসমাবেশে তাকে খারাপ বলে, তখন তার মাঝে লজ্জা সৃষ্টি হবে। তাই ফাসেককে সালাম দেয়া মাকরূহ। এতে সে সতর্ক হবে এবং তার নিজের আমল সম্পর্কে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হবে। (২) আল্লাহ তাআলার নিকট প্রকাশ্য পাপাচারীর কোন সম্মানই নেই। তাই হাদীস শরীফে এসেছে إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى —ফাসেক পাপাচারীর প্রশংসা করা হলে আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হন।

—(মেশকাতুল মাসাবীহ—হেফযুল লেসান অধ্যায়)

অতএব, বান্দাকুলেরও ফাসেক পাপাচারীকে সম্মান প্রদর্শন করা অনুচিত। তবে এক্ষেত্রেও শরীঅত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করা কর্তব্য। সাহাবায়ে কেরাম মোনাফেক ও কাফেরদের দোষ বর্ণনা করতেন এবং সত্যপন্থী ওলামায়ে কেরাম অত্যাচারী জালেম শাসকদেরকে কোন প্রকার সম্মানই দিতেন না।

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা লিখিত হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হারূনুর রশীদ ওলামায়ে কেরামের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা রাখতেন। তাঁদেরকে যথোচিত সম্মান শ্রদ্ধা করতেন। আলেম এবং পুণ্যশীলদের সাহচর্য অবলম্বন করে চলতেন। তিনি খলীফা হলে হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) ব্যতীত ওলামায়ে কেরামের সকলেই তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য উপস্থিত হয়। তখন হারূনুর রশীদ হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর নামে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন—

সুফিয়ান! আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করেছিলাম, আজও আমি তা ছিন্ন করিনি। আমি যদি শাসক পদে অধিষ্ঠিত না হলে নিজেই আসতাম। আমি শাসক পদে অধিষ্ঠিত হলে সবাই আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসে। ব্যতিক্রম শুধু তুমি। হে সুফিয়ান! আমি বায়তুল মাল— কোষাগার উন্মুক্ত করে সবাইকে মাল-সম্পদ দিয়েছি। আমি তোমার সাক্ষাতের জন্য খুবই আগ্রহী। পত্রপ্রাপ্তি মাত্র অনতিবিলম্বে এদিকের উদ্দেশে রওয়ানা হও।

ইতি—

হারূন এ চিঠি লেখে আব্বাদ তালেকানীর হাতে দিয়ে তাকে কুফায় অবস্থিত হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর উদ্দেশে রওয়ানা করে দেন। আব্বাদ কুফায় যখন হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মসজিদে উপনীত হন, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। পত্রবাহক আব্বাদ খলীফা হারূনের চিঠি হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর সম্মুখে ছুঁড়ে মারে। তিনি সালাম ফিরিয়ে হারূনের পত্রের প্রতি কোন সম্মান দেখালেন না। তার রাষ্ট্র ক্ষমতাধিকারী হওয়ার গুরুত্বও অনুধাবন করলেন না। লোকজনকে বললেন— এ পত্র জালেম হারূনের কাছ থেকে এসেছে। আমি এ পত্র স্পর্শ করে হাত বরবাদ করব না। তোমরা পত্র খুলে বিষয়বস্তু আমাকে পড়ে শুনাও। উপস্থিত লোকজন পত্র খুলে পড়ে তাঁকে শুনান। তিনি বললেন, এ পত্রের জবাব পত্রের উল্টা পিঠেই লেখে দাও। লোকেরা বলল, সুফিয়ান! হারূন খলীফা! তার চিঠির জবাব আলাদা কাগজে লেখাই উত্তম। তিনি বললেন, এ জালেমের পত্রের জবাব তার পত্রের পিঠেই লেখে দাও। অতএব, হারূনের পত্রের জবাবে লেখা হল—

হারূন! আমি তোমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। তোমার বন্ধুত্ব হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তুমি সরকারী কোষাগারের সম্পদ

যথাস্থানে ব্যয় করনি; বরং বিনষ্ট করেছ। কেয়ামতের দিন আমি এর সাক্ষ্য দেব এবং তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব আল্লাহর দরবারে উন্মোচন করে দেব। হে হারূন! তুমি ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়েছ, রেশমী পোশাক পরতে শুরু করেছ, জালেম বনতে পছন্দ করেছ; বরং জালেমদের নেতার আসনে সমাসীন হয়েছ। হে হারূন! তোমার কি অবস্থা হবে, যখন হকের দাবীদাররা তোমার আঁচল ধরে বসবে। তোমার পুণ্য কর্মসমূহ সবই দাবীদাররা নিয়ে নেবে, তাদের বদীসমূহ তোমার উপর চাপাবে। হে হারূন! এ হিতোপদেশ স্মরণ রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। হে হারূন! এখন আর তুমি আমাকে কোন চিঠিপত্র লেখবে না, কক্ষনো আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করবে না।

ইতি—

সুফিয়ান সওরী (রঃ) উল্লিখিত বিষয়বস্তু হারূন প্রেরিত চিঠির পিঠে লেখে বাহক আব্বাদ তালেকানীর হাতে দেন। সে এ চিঠি হারূনের নিকট পৌঁছায়। এ পত্র পাঠে হারূন খুবই ভীত শংকিত হয়ে পড়েন। আমৃত্যু এ পত্র তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

—(এহইয়াউল উলূম—আমরুল ওমারা বিলমারূফ অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

ইবনে আবিদ দুনইয়া তাউস (রঃ) বলেন, একদিন আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে বসা ছিলাম। এক লোক উচ্চ স্বরে লাব্বায়ক—আমি উপস্থিত বলল। হাজ্জাজ এ লোককে তার সম্মুখে হাযির করতে লোকজনকে নির্দেশ দেয়। হাজ্জাজ আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল— ওহে! তোমার দেশ কোথায়? আগন্তুক জবাব দিল, আমার দেশ ইয়ামান। হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস করল, ইয়ামানের শাসক— আমার ভাই মুহাম্মদ বিন ইউসুফ কেমন আছে, তুমি তাকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ? সে বলল, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ প্রকাণ্ড দেহের অধিকারী। রেশমী পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত। হাজ্জাজ বলল, আরে! আমি তো তোমাকে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের আকৃতি এবং পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি? বরং তার আচার আচরণ, সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। আগন্তুক নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে বলতে শুরু করল—

হে হাজ্জাজ! মুহাম্মদ বিন ইউসুফ মুসলমানদের উপর অত্যন্ত জুলুম করে, নিজের প্রভুর বিরোধিতা করে, সভাসদ মোসাহেবদের আনুগত্য করে।

লোকটির এরূপ সুস্পষ্ট বক্তব্য শুনে হাজ্জাজ খাপ্পা হয়ে বলতে লাগল, ওহে! মুহাম্মদ বিন ইউসুফের আমার নিকট কি মর্যাদা, তা কি তুমি জান? সে আমার ভাই। তুমি কি করে আমার সামনে তার নিন্দাবাদ্ করছ? আগন্তুক জবাব দিল, হাজ্জাজ! তোমার নিকট তোমার ভাইয়ের যে মর্যাদা, আমার নিকট আল্লাহর সম্মান মর্যাদা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কেননা, আমি হজ্জ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী। হাজ্জাজ এহেন ভয়লেশহীন বেপরোয়া জবাবে চুপসে যায়।

তাউস (রঃ) বলেন, সে লোক হাজ্জাজের ঘর থেকে বের হলে আমিও তার অনুগমন করি। আমি তাকে বললাম, হে ভাই! আমি তোমার সাহচর্য লাভের আকাঙ্ক্ষী। সে বলল, হে তাউস! আমার নিকট তোমার কিছুমাত্র সম্মান মর্যাদা নেই। কেননা, সবেমাত্র তুমি হাজ্জাজের নিকট বসা ছিলে। আমি বললাম, আরে ভাই! হাজ্জাজ স্বৈরাচারী শাসক, সে আমাকে ডেকেছে বলে বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে। সে বলল, তাউস! তুমি কেন হাজ্জাজকে হিতোপদেশ দিলে না। তার সাথে হেলান দিয়ে বসে আরাম করতে লেগে গেলে—এর কি প্রয়োজন ছিল? —(হায়াতুল হায়ওয়ান—তাউসের আলোচনা)

সূক্ষ্মতত্ত্ব

ফাসেক পাপাচারীর গীবত শুধু দ্বীনী বিষয়েই বৈধ। যেমন— এরূপ আলোচনা করা— সে নামায পরিত্যাগী, রোযা রাখে না, গীবত করে, মানুষ হত্যা করে, যেনা করে ইত্যাদি। দ্বীনী বিষয় ব্যতীত ফাসেকের গঠন আকৃতি, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির দোষ বর্ণনা বৈধ নয়। কেননা, এগুলো তার ক্ষমতাধীন বিষয় নয়। তাই এসব ব্যাপারে গীবত নিরর্থক।

— (নুযহাতুল মাজালেস, সীরাতে আহমদিয়া প্রভৃতি)

হেফাযতের উদ্দেশে গীবত

কারো জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তা অবগত না থাকলে তখন ক্ষতিকারীর গীবত করে ক্ষতিগ্রস্তকে সাবধান করা বৈধ। যাতে তার কারণে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

— (এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস, সীরাতে আহমদিয়া, আইনুল এলেম, তাম্বীহুল গাফেলীন, মাতালেবুল মোমেনীন, দোররে মোখতার, শরহে সহীহ মুসলিম)

বৈধ গীবতের কয়েকটি উদাহরণ

প্রথম উদাহরণ—কেউ গোপনে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত। কোন আলেম, আল্লাহভীরু লোক তার উঠাবসা করে। আলেম, আল্লাহভীরু লোকটি যদি পর্দার অন্তরালে অন্যায়কারী সম্পর্কে অবহিত না হয়, তা হলে বরবাদ হবার শংকা রয়েছে। তাই মানুষ এ লোককে ভয় করুক, তার সংস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করে চলুক– এ উদ্দেশে তার অন্যায় অপরাধ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করা বৈধ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং অন্যের দোষত্রুটি বর্ণনা করেছেন। কারো কারো উপর লানত অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাতে মানুষ তার অন্যায় অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَتَرْغَبُوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ بِمَا فِيْهِ اَهْتَكُوْهُ حَتّٰى يَعْرِفَهُ فِىْ النَّاسِ اُذْكُرُوْهُ بِمَا فِيْهِ حَتّٰي يَحْذَرُهُ النَّاسُ

— তোমরা কি পাপাচারীর পাপকর্মের আলোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে চল? তোমরা তাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন কর। তার নিন্দাবাদ কর, দোষ বর্ণনা কর, তা হলে মানুষ তাকে ভয় করবে— এড়িয়ে চলবে।

—(এহইয়াউল উলূম—আলআযারুল মোরাখখাসাহ লিলগীবত অধ্যায়)

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— اُذْكُرُوا الْفَاسِقَ بِمَا فِيْهِ يَحْذَرُ النَّاسَ —তোমরা ফাসেক পাপাচারীর নিন্দাবাদ কর, তা হলে মানুষ তার থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে।

—(জাওয়াহেরুত তাফসীর, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস)

দ্বিতীয় উদাহরণ

যদি কেউ মানুষকে কষ্ট দেয় তা হলে তার দোষ প্রকাশ করা, নিন্দাবাদ করা বৈধ। যেমন— বলবে, অমুকের দ্বারা মানুষজন কষ্টে পড়ে, সে নিজের আচার-আচরণ দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেয়, চোগলখোরী করে, ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই কেউ দাস-দাসী বিক্রি করতে তার দোষ ক্রেতার নিকট প্রকাশ করে দেবে। তা হলে ক্রেতা কষ্টে পড়বে না।

তৃতীয় উদাহরণ— বিচারকের আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হলে বাদী তার দাবী প্রমাণে সাক্ষী হাযির করবে। বিবাদী যদি

সাক্ষীদের দোষ-ত্রুটি বা কোন অন্যায় অপরাধ এবং তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে জানে, তবে তার উচিত তাদের অন্যায় অপরাধ এবং মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা প্রকাশ করে দেয়া, যাতে মোকদ্দমায় বাস্তব অবস্থার বিপরীত রায় ঘোষিত না হতে পারে।

অন্যকে কষ্ট থেকে রক্ষার উদ্দেশে গীবতের বৈধতা সম্পর্কিত কিছু ঘটনা নিম্নে লিখিত হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রাঃ)-কে আবু আমর বিন হাফস (রাঃ) তালাক দিলে হযরত মোআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং হযরত আবু জাহম (রাঃ) বিয়ের পয়গাম পাঠান। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ পয়গাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করলে তিনি বললেন, মোআবিয়া নিঃস্ব গরীব মানুষ, আর আবু জাহম খুব বেশী মারপিট করে, নিজের কাঁধ থেকে কখনও ছড়ি নামায় না। সুতরাং তুমি এ দুই জনের কাউকেই বিয়ে করো না; বরং তুমি ওসামা বিন যায়দকে বিয়ে কর।

—(জাওয়াহেরুত তাফসীর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক লোক নিজের গোলাম বিক্রি করতে ক্রেতাকে বলে দিল, এ গোলামটির দোষ আছে, সে চোগলখোর— কূটনামী করে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করে। ক্রেতা বলল, কোন অসুবিধা নেই। ক্রেতা গোলামটি ক্রয় করে নিলে সে ফাসাদ বিস্তার করে। মনিব পত্নীকে সে বলল, আপনার স্বামী আপনাকে ভাল জানে না; সে অন্য মেয়েলোক আনতে চায়। এর প্রতিকার হচ্ছে, যখন আপনার স্বামী নিদ্রা গমন করবে, তখন ক্ষুর দিয়ে তার নিতম্বের লোম মুণ্ডিয়ে দেবেন, তা হলে সে আপনাকে ভাল জানবে। অন্য দিকে মনিবকে গিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী আপনাকে জবাই করতে চায়। একদিন মনিব এমনিতেই নিদ্রার ভান করে চোখ মুদে শুয়ে পড়ে। গোলামের পরামর্শ মোতাবেক মেয়েলোকটি ক্ষুর নিয়ে আসে। স্বামী চোখ খুলে, দেখল, সত্যিই স্ত্রী তাকে জবাই করতে আসছে। সে তৎক্ষণাত স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে। এ সংবাদ স্ত্রীর বংশের লোকদের নিকট পৌঁছলে তারা তার হন্তা স্বামীকে হত্যা করে। এ গোলামের চোগলখোরীর কুফলস্বরূপ এ ফাসাদ সংঘটিত হয়ে দুইটি নিরপরাধ প্রাণ ঝরে গেছে।

—(এহইয়াউল উলূম—গীবত অধ্যায়)

সূক্ষ্মতত্ত্ব

যদি কেউ গোপনে আড়ালে আবডালে গোনাহে লিপ্ত থাকে এবং তার গোনাহের কারণে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়, তা হলে এমন ব্যক্তির গীবত করা নাজায়েয; বরং যে কারো দোষ প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহ তাআলাও তার দোষ মানুষকে অবহিত করে দেন।

উপদেশবাণী

কিছু সম্মানিত জনের উক্তি— لَا تَصْحَبْ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَكْتُمُ سِرَّكَ وَيَسْتُرُ عَيْبَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَلَا تَصْحَبْ إِلَّا نَفْسَكَ —শুধু সে ব্যক্তির সাথেই উঠাবসা কর, সম্পর্ক রাখ, যে তোমার দোষ গোপন রাখবে। তোমার গোপনীয়তা ফাস করবে না। এমন লোক পাওয়া না গেলে কারো সাহচর্যই অবলম্বন করবে না; বরং নিজের মনের বন্ধুত্ব অবলম্বন করবে।

—(এহইয়াউল উলূম—আসসেফাতুল মাশরাতাতু লিসসোহবত অধ্যায়)

হযরত যায়দ বিন আসলাম (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْغِيْبَةُ مَنْ لَمْ يُعْلِنْ بِالْمَعَاصِيْ —যে নিজের অন্যায় প্রকাশ করে না, গোপনে গোনাহে লিপ্ত, তার গীবত অবশ্যই গীবত হবে। আর যে প্রকাশ্যে পাপাচারে ডুবে থাকে, তার গীবত অবশ্যই গীবত হবে না। —(দোররে মনসূর)

এ সম্পর্কে দুইটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمْ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ

—যে নিজের মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করবে, কেয়ামতে আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন করবেন। আর যে তার মুসলমান ভাইয়ের গোপন গোনাহসমূহ প্রকাশ করবে, আল্লাহ তাআলাও তার গোনাহসমূহ প্রকাশ করে দেবেন। —(নুযুহাতুল মাজালেস—আলএহসান আলাল ইয়াতীম অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— لَا يَسْتُرُ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللّٰهُ —যে বান্দা কারো দোষ গোপন রাখবে, কেয়ামতে আল্লাহও তার দোষ গোপন রাখবেন। —(মুসলিম ঃ গীবত অধ্যায়)

নির্লজ্জের গীবত

যে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার অন্যায়ে লিপ্ত থাকে, এমন নির্লজ্জের গীবত বৈধ। যদি কেউ তাকে মন্দ বলে তাতেও সে প্রভাবান্বিত হয় না, লজ্জা তার কাছে ঘেঁষে না, তার থেকে বহু যোজন দূরে পালায়। কবির ভাষায়—

বলা হয়, তার গীবত বৈধ, যদি কেউ প্রকাশ্যে মহা অপরাধ সংঘটিত করে।

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর হন্তাদের গীবত করতেন এবং তাদের সম্পর্কে ভর্ৎসনা তিরস্কারপূর্ণ উক্তি করতেন। এর কারণ, তারা ছিল লজ্জাহীন। নিজেদের অপকর্মকে তারা প্রজ্ঞা কৌশল বলে মনে করত।

—(এহইয়াউল উলূম, আইনুল এলেম, সীরাতে আহমদিয়া, দোররে মোখতার, রদ্দুল মোহতার [শামী], মাতালেবুল মোমেনীন)

নিম্নে নির্লজ্জের গীবত সম্পর্কিত কিছু জরুরী আলোচনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

হাদীস শরীফে আছে—مَنْ اَلْقٰى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهٗ — যে লজ্জার পর্দা ছুঁড়ে ফেলে, তার গীবত বৈধ।

—(আবুশ শায়খ (রঃ)-এর সূত্রে শরহে আইনুল এলেম)

হযরত শেখ সা'দী (রঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত বৈধ। (১) নির্লজ্জ, (২) জালেম শাসক, (৩) যে গোপনে অন্যায় করে এবং মানুষের ক্ষতি করে।

এ সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ)-এর কবিতার মর্ম নিম্নরূপ—

— আমি শুনেছি, তিন ব্যক্তির গীবত বৈধ। এর থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চতুর্থ জনের গীবত অবৈধ।

— তাদের তিন জনের একজন জুলুমপ্রিয় বাদশা। কেননা, তার কারণে তুমি মানুষের অন্তর দুঃখ ভারাক্রান্ত পাবে।

— যে গোপনে অন্যায় অপরাধ সংঘটন করে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করা বৈধ। যাতে মানুষ তার থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে পারে।

— তৃতীয় সে, যে নির্লজ্জতার ভূষণ পরে আছে, যে নিজেই নিজের পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছে।

— তার দোষ অন্বেষণে গোনাহের দ্বারস্থ হয়ো না, যে নিজেই ঘাড় পর্যন্ত কুয়ায় ডুবে আছে।

— আর ওজনে কমদানকারী সম্পর্কে যা জান বল।

আফসোস অনুশোচনাচ্ছলে গীবত

আফসোস অনুশোচনা প্রকাশার্থ গীবত করা বৈধ। যেমন— আফসোস! অমুকে নামায পড়ে না। অথবা যেনায় লিপ্ত— এ কারণে তার উপর আমার আফসোস হয়। কেননা, কারো কাজের উপর আফসোস প্রকাশ ভাল কাজ। বরং কোন মুসলমানকে গোনাহে জড়িত দেখলে তার অবস্থার উপর এবং শয়তান তার উপর প্রবল হওয়ার কারণে অন্য মুসলমানের তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা এবং তার জন্য দয়ার্দ্র চিত্ত হওয়া উচিত।

—(সীরাতে আহমদিয়া, খাযানাতুর রেওয়ায়াত, তানবীরুল আবসার, রদ্দুল মোহতার)

উপদেশবাণী

হযরত শাকীক (রঃ) বলেন—

إِذَا ذَكَرْتَ الرَّجُلُ بِسُوْءٍ وَلَمْ تَهْتَمَّ لَهُ تَرَحُّمًا فَأَنْتَ أَسْوَءُ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْتَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَلَمْ تَجِدْ فِيْ قَلْبِكَ حَلَاوَةً طَاعَةِ رَبِّكَ فَأَنْتَ رَجُلٌ أَسْوَءُ

— কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে তার মন্দ গুণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করলে তা গীবত হবে। আর যদি দুঃখ প্রকাশার্থ আলোচনা করা হয়, তবে তা গীবত গণ্য হবে না। —(খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

অপরিচিত ব্যক্তির গীবত

কারো নাম না বলে তার খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা বৈধ।

—(বায্‌যাযিয়া, সীরাতে আহমদিয়া, দোররে মোখতার, খাযানাতুর রেওয়ায়াত, তাম্বীহুল গাফেলীন)

কারো সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ খারাপ উপাধির আলোচনা

যদি সাধারণ্যে কারো কোন খারাপ উপাধি প্রসিদ্ধ থাকে এবং তাতে সে ব্যক্তির দোষও প্রকাশ পায়, তা হলে সে উপাধি সহকারে তার আলোচনায়

কোন দোষ হবে না। কেননা, এ উপাধি সহকারে না বললে মানুষ তাকে চিনবে না। যেমন— কারো উপাধি লেংড়া। আর মোহাদ্দেসীনে কেরামও হাদীসের অনেক বর্ণনাসূত্রে عَنِ الْأَعْرَجِ —লেংড়া হতে বর্ণিত—এরূপ বলেছেন। তবে যথাসম্ভব কারো দোষযুক্ত উপাধি বর্ণনা না করাই উচিত। —(এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস, রদ্দুল মোহতার, মাতালেবুল মোমেনীন, শরহে মুসলিম লিইমাম নববী)

দ্বীনের শক্তিবর্ধনের উদ্দেশে গীবত

দ্বীনের শক্তি বর্ধনের উদ্দেশে গীবত করা বৈধ। যেমন— হাদীসবেত্তাগণ একজন আরেকজনের দোষ বর্ণনা করেন। তারা কারো সম্পর্কে লেখেন— অমুক মিথ্যায় অভ্যস্ত, হাদীস বর্ণনায় খুব বেশী মিথ্যা বলে। অথবা অমুক বর্ণনাকারী নিজের তরফ থেকে হাদীস বানিয়ে বলে, অমুক হাদীস জাল করায় অভ্যস্ত, অথবা অমুক বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি কম, অমুক বর্ণনাকারীর হাদীস মুখস্থকরণে গড়বড় হয়ে যায়, ইত্যাদি। অনুরূপ সম্মানিত ফকীহগণ লেখেন—অমুক কিতাব অনির্ভরযোগ্য। কেননা, এ গ্রন্থ প্রণেতা নিজে ফকীহ নন। অথবা অমুক কিতাবের সংকলক মোতাযেলী; সুতরাং তার অভিমত অগ্রহণযোগ্য। অথবা অমুক ব্যক্তি তাঁর কিতাবে দুর্বল মাসআলাসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। অথবা অমুক ফকীহ তাঁর কিতাবে জাল বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করেছেন, নিজের কথার সমর্থনে দুর্বল বর্ণনাসূত্র গ্রহণ করেন, ইত্যাদি। এ ধরনের আলোচনা গীবত নয়। —(রদ্দুল মোহতার)

উপদেশদানের উদ্দেশে গীবত

আমার (গ্রন্থকার) মতে, মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে জীবিত অথবা মৃত কারো গীবত করা এবং গীবতের শাস্তির উল্লেখ বৈধ। যেমন বলা— অমুক জাহান্নামের উপযোগী। কেননা, সে কৃপণ। উদ্দেশ্য, সে যেন কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। অথবা বলা, অমুক জীবতকালে অনেক বেশী গোনাহ করত, মৃত্যুর পর সে আযাবে পতিত হবে। অথবা বলা, অমুক কবরে আযাব ভোগ করছে। কেননা, সে অমুক গোনাহ করেছিল। অথবা বলা, মৃত্যুর পর অমুকের চেহারা কালো হয়ে গেছে। কেননা, সে অমুক গোনাহ করত। অথবা বলা, আমি অমুককে আযাবে পতিত দেখতে পেয়েছি। এরূপ বলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উপদেশ প্রদান উদ্দেশ্য। সুতরাং এতে গীবত হবে না।

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরস্তানের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। এ সময় তিনি মানুষকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশে বলেন, এ দুই কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে। একজনের উপর আযাবের কারণ— সে চোগলখোরী করত। আর দ্বিতীয় জন প্রস্রাব করার সময় পর্দা করত না; বরং সতর উন্মুক্ত রাখত। —(তিরমিযী)

দ্বিতীয় ঘটনা

যখন সোলায়মান বিন আবদুল মালেক শাসক এবং হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয তার সভাসদ হন, তখন সোলায়মান হাজ্জাজের মন্ত্রী ইয়াযীদ বিন মুসলিমকে সচিব নিযুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) বললেন, হে সোলায়মান! হাজ্জাজের আলোচনা করবেন না এবং তার মন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। জবাবে সোলায়মান বললেন, ওমর! আমার জানা মতে সে হাজ্জাজের কোন অনিষ্ট বা তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ)-এর উদ্দেশ্য, যেন সোলায়মান হাজ্জাজের মন্ত্রীকে সচিব নিযুক্ত না করেন, তা হলে তিনি তাদের জুলুমের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন।

—(হায়াতুল হায়ওয়ান—আহওয়ালে সোলায়মান বিন আবদুল মালেক)

তৃতীয় ঘটনা

একদিন হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) কেয়ামতের ভীতিকর অবস্থার কথা স্মরণ করেন অনেক কান্নাকাটি করেন। এমনকি তাঁর হেঁচকি এসে যায়। হঠাৎ করে তিনি হাসতে শুরু করেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, কেয়ামত কায়েম হয়ে গেছে এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে হিসাব গ্রহণের উদ্দেশে ডাকা হয়েছে। তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং হিসাব সহজ করে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। অনুরূপ হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী (রাঃ) হিসাব দিয়ে জান্নাত অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। অতঃপর এক ব্যক্তি আমাকে ডাকে। আমি অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হই। আমার উপরও আল্লাহ তাআলা অশেষ মেহেরবানী করে কঠিন হিসাব নেননি। এ সময় আমি এক মুর্দাকে দেখে তার অবস্থা

জিজ্ঞেস করি। সে বলল, আমি হাজ্জাজ— কঠোর আযাবে পাকড়াও হয়ে আছি। তবে আল্লাহ তাআলার ক্ষমার অপেক্ষায় রয়েছি—মুসলমান যে জন্য অপেক্ষমাণ আমিও সে জন্য অপেক্ষমাণ।

—(নুযহাতুল মাজালেস—আল-আদল অধ্যায়)

হাজ্জাজের কুফরী সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। তবে উদ্ধৃত ঘটনা থেকে জানা গেল, সে মোমেন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

চতুর্থ ঘটনা

এক আনসারীর বোন মৃত্যুবরণ করে। বোনকে দাফন শেষে ঘরে ফিরে আসলে তার স্মরণ হল, তিনি কবরে একটি থলিয়া ফেলে এসেছেন। তিনি কবর খুঁড়ে নিজের ফেলে আসা থলিয়া বের করে নিতে চাইলেন। কবরের পার্শ্ব খুঁড়তেই তিনি দেখতে পেলেন, কবর আগুনে ভর্তি হয়ে আছে। তাঁর বোনের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তিনি অনতিবিলম্বে কবর বন্ধ করে ঘরে এসে মায়ের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁকে বোনের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মা বললেন, তোমার বোনের এমন কোন দোষ ছিল না, তবে সে চোগলখোরীতে অভ্যস্ত ছিল; নামায শেষ ওয়াক্তে পড়ত এবং পবিত্রতা লাভে কমতি করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই তার উপর আযাব হচ্ছে।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—আযাবিল কবর অধ্যায়)

মোআবিয়া বিন ইয়াযীদের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিত্যাগ

ইয়াযীদ বিন মোআবিয়া (রাঃ) এ নশ্বর জগত হতে অবিনশ্বর জগতের পথে রওয়ানা হয়ে গেলে মানুষ তার পুত্র মোআবিয়াকে খলীফা বানায়। তিনি যেহেতু অত্যন্ত মোত্তাকী ছিলেন, তাই রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। তিনি লোকজনের উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ শেষে বলেন—

লোকসকল! আমার মাননীয় দাদা হযরত মোআবিয়া (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) হতে খেলাফত ছিনিয়ে নিয়ে এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে লড়াই করে খুব খারাপ করেছেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তিনি কবরে চলে যান এবং ধন সম্পদ সবই ছেড়ে যান। তিনি নিজের আমলের উপর লজ্জিত এবং কবরে অনুশোচনাগ্রস্ত। অতঃপর রাষ্ট্রক্ষমতা আমার পিতা ইয়াযীদের প্রতি স্থানান্তরিত হয়। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করেননি। নিজের উপর জুলুম করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের সঙ্গে অশোভনীয় মন্দ আচরণ করেছেন, তাঁদের উপর অনেক কঠোরতা করেছেন, কষ্ট দিয়েছেন। অবশেষে তাঁর জীবনকাল সমাপ্ত হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় নেন। অতঃপর দুষ্কর্ম কবরে তাঁর সাথী হয়। লজ্জা অনুশোচনা আর অনুতাপই তাঁর হাসিল হয়। আমি জানি না তাঁকে আযাব প্রদান না দয়া প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, কবরে তাঁকে আযাবই প্রদান করা হয়েছে (একথা বলে তিনি খুব কাঁদেন)। এখন আমি তৃতীয় জন। আমার অন্তর রাষ্ট্রক্ষমতার উপর বিষিয়ে গেছে। কেননা, আমি গোনাহে পড়তে ইচ্ছুক নই। হে লোকসকল! তোমরা অন্য কাউকে খলীফা বানিয়ে নাও। আমাকে ছাড়।

এ ভাষণের মধ্য দিয়ে মোআবিয়া বিন ইয়াযীদ রাষ্ট্রক্ষমতা পরিত্যাগ করেন এবং জীবতকাল পর্যন্ত আল্লাহর এবাদতে রত থাকেন।

—(হায়াতুল হায়ওয়ান)

পঞ্চম ঘটনা

হযরত আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়দ (রঃ) বলেন, এক বছর আমি হজ্জের উদ্দেশে গমন করি। পথে এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে সব সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এত অত্যাবশ্যকরূপে দুরূদের আমল কেন কর? সে বলল, আমি প্রথম বার আমার আব্বার সাথে হজ্জে গমন করি। হজ্জ শেষে ফেরার পথে আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে কে একজন আমাকে বলল, ওহে! উঠ। তোমার আব্বা মারা গেছেন। আমি উঠে দেখলাম আমার আব্বা মরে পড়ে আছেন এবং নাফরমানীহেতু আল্লাহ্‌র ক্রোধে তাঁর চেহারা কাল হয়ে গেছে। এ অবস্থা দর্শনে আমি চিন্তিত অবস্থায় বসে রয়েছি। ইত্যবসরে আমি স্বপ্নে দেখলাম, কাল চেহারার চার লোক আযাব দেয়ার উদ্দেশে লোহার গুর্জ হাতে আমার আব্বার মাথার কাছে খাড়া। আচম্বিতে এক সুদর্শন ব্যক্তি এসে আমার আব্বার চেহারায় হাত ফিরিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আব্বার চেহারার কালো বর্ণ দূরীভূত হয়ে সুদর্শন হয়ে গেছে। আমি স্বপ্ন মধ্যেই তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আমি উঠে দেখলাম, আমার আব্বার চেহারার কালো বর্ণ দূরীভূত

হয়ে শুভ্রতায় ছেয়ে গেছে। সেদিন থেকেই আমি অত্যাবশ্যকরূপে দুরূদ শরীফ পড়ি। —(এহইয়াউল উলূম—মানামাতিল মাওতা)

উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে জানা গেল, মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে কারো মন্দ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা বৈধ।

ষষ্ঠ ঘটনা

এক যুবক সাহাবী হযরত আলকামা (রাঃ)-এর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হয়। তাঁর স্ত্রী এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বলে পাঠান। তিনি হযরত বেলাল, আলী, সালমান এবং হযরত আম্মার (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, যাও! আলকামার অবস্থা দেখে আস। এ চার জন সাহাবী গিয়ে দেখলেন, আলকামার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী, কিন্তু তাঁর মুখে কালেমা বেরোচ্ছে না। তাঁরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবস্থার সংবাদ দেন। তিনি আলকামা (রাঃ)-এর বৃদ্ধা মাকে ডেকে এনে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। তাঁর মা বললেন, সে খুব বেশী নামায পড়ত, রোযা রাখত এবং সদকা করত, কিন্তু স্ত্রীর তাবেদারী করে আমার নাফরমানী করত। মায়ের বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ জন্যই তার মুখ দিয়ে কালেমা বেরোচ্ছে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকামা (রাঃ)-এর মাকে বললেন, তুমি পুত্রের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দাও, যাতে তার পরিণাম কল্যাণকর হয়। মা বললেন, আমার মনে অনেক কষ্ট, আমি ক্ষমা করতে পারি না। তাঁর মায়ের এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, লাকড়ি জমা করে আলকামাকে জ্বালিয়ে দাও। এ শুনে আলকামার মায়ের সন্তান বাৎসল্য উথলে উঠে। তিনি পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। মায়ের ক্ষমা করে দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে পাঠালেন, গিয়ে দেখ, আলকামার কি অবস্থা। তিনি গিয়ে দেখলেন; হযরত আলকামা (রাঃ) কালেমা শাহাদাত পাঠ করছেন। অতঃপর সেদিনই তিনি ইনতেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকামা (রাঃ)-এর কাফন দাফন শেষে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এরশাদ করলেন, হে আনসার মুহাজেরীন! যে মায়ের উপর স্ত্রীকে মর্যাদা দেয়, তার উপর আল্লাহর এবং ফেরেশতাকুলের লানত। তার ফরয নফল কোন এবাদতই গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় উপনীত হতে পারে না। —(তাম্বীহুল গাফেলীন)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, মানুষজনকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলকামা (রাঃ)-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর একটি খারাপ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছেন।

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মানুষকে উপদেশদান এবং মন্দ কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে কারো দোষ আলোচনা বৈধ।

পরিশিষ্ট—অবৈধ গীবতের সংজ্ঞা

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে জানা গেল, তের প্রকারের গীবত বৈধ এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। শরীঅতে যে গীবত হারাম তা হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত করা, যে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার দ্বারা মানুষের কোন প্রকার ক্ষতিও হয় না, সে নির্লজ্জও নয় এবং গীবত দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য; যে গীবত দ্বারা দ্বীনী কোন উপকারিতা লাভ উদ্দেশ্য নয়, শুধু এরূপ গীবতই শরীঅতে হারাম করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অপরিচিত অনির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত বৈধ। আর যে খোলামেলা বা পর্দার অন্তরালে গোনাহে লিপ্ত, তার গোনাহ দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ব্যক্তির গীবত বৈধ। অনুরূপ হেয় প্রতিপন্ন করা নয়; বরং দুঃখ প্রকাশার্থ বা কোন বৈধ উপকারিতা লাভের জন্য কারো গীবত করা, উদাহরণস্বরূপ নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য অথবা কোন মাসআলা জানার জন্য, কিংবা ফতোয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ অথবা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে গীবত বৈধ।

চতুর্থ শাখা

গীবতের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

গীবত হারাম

গীবত অকাট্য হারাম এবং এর হারাম হওয়া সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। গীবতের হারাম হওয়া অস্বীকারকারী কাফের। অর্থাৎ, যে বলবে গীবত হালাল, সে কাফের হয়ে যাবে এবং দ্বীনের সহজ সরল পথ থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, গীবত হারাম হওয়া কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। পরন্তু অনেক হাদীস দ্বারাও তা প্রমাণিত এবং গীবত হারাম

হওয়ার ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য)ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গীবতের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ) উপদেশমূলক কবিতা পংক্তি। তার মর্মার্থ হচ্ছে—

অনুপস্থিত বন্ধুর ব্যাপারে দুইটি বিষয় বন্ধুর জন্য হারাম। প্রথমতঃ অবৈধ পন্থায় তার সম্পদ ভোগ করবে না, দ্বিতীয়তঃ তার দুর্নাম করবে না।

'রওযা' গ্রন্থ রচয়িতা গীবতকে সগীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। আবদুর রহমান সফূরী সহ অন্য কিছু আলেমও গীবত সগীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হবার প্রবক্তা। তবে তাঁদের মতেও ওলামা এবং হাফেযদের জন্য গীবত কবীরা গোনাহ। কিন্তু ইমাম কুরতবী (রঃ) গীবত কবীরা গোনাহ হওয়া সম্পর্কে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উল্লেখ করেছেন। আলী ইবন আহমদুল আযীযী 'শরহে জামেয়ে সগীর ফী হাদীসিল বাশীরিন নাযীর' গ্রন্থে এ অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই সোলায়মান জুমাল তাফসীরে জালালাইনের টীকা গ্রন্থে লেখেছেন, গীবত কবীরা গোনাহ হওয়া সম্পর্কে কারো মতভেদ নেই। আর এ অভিমতই সত্য।

বর্তমানকালে সর্বপ্রকার বিপদের কারণ গীবত

গীবতের গোনাহের কারণে বর্তমানকালে বিভিন্ন রকমের গজব নাযিল হচ্ছে। কোথাও ভূমি ধসে যাচ্ছে। কোথাও শহর ধ্বংস বরবাদ হচ্ছে। কোথাও পানি নেই, কোথাও পানির সয়লাব। কোথাও অত্যধিক শীত আবার কোথাও অত্যধিক গরম। কোথাও অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। কোথাও লু হাওয়া বইছে। কোথাও আগুন লাগছে। কোথাও প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত্যা মানুষ মারছে, গাছের পাতাসমূহ ঝরাচ্ছে। কোথাও শাসক জালেম, কোথাও শহর জনপদ শত্রু কবলিত। কোথাও সাংবৎসর কলেরা মহামারী লেগে থাকে। কোথাও সমুদ্র ফুঁসে উঠে। কোথাও সর্দি জ্বরের বিপদ, কোথাও শিরঃপীড়ার মহামারী, কোথাও অন্য আযাব। একমাত্র গীবতের কারণে এসব বিপদাপদ প্রকাশ পাচ্ছে।

আমাদের কর্তব্য উক্ত সব বিষয় হতে তওবা করা। আর মানুষের ব্যাপার বিস্ময়কর। কোথাও বৃষ্টি বর্ষিত না হলে অথবা বিপদ কষ্টের কারণ হলে তারা খুব বেশী ঘাবড়ে যায় এবং দোআর জন্য হাত উঠায়। অথচ গীবতের কারণে তাদের দোআ কবুল হয় না। তারা সর্বদা আযাবেই পতিত

থাকে– মানসিকভাবে বিষণ্ণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। অথচ নিজেদের গোনাহের কথা খেয়ালই করে না। গীবত করতে তাদের কোন প্রকার বিষণ্ণতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয় না। এসব কারণে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। কোন অবস্থায়ই তাদের অন্তর কোন হিতোপদেশ কবুল করে না।

গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াতের আলোচনা

আল্লাহ্ তাআলা কোরআন মজীদে এরশাদ করেন—

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ-

— তোমরা একে অন্যের গীবত করো না; কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? অবশ্য তোমরা তা অপছন্দই করবে।

তাই গীবতও অপছন্দ করা আবশ্যক। কেননা, গীবতও মৃতের গোশত খাওয়ার অনুরূপ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গীবতকে গোশত ভক্ষণের মত বলেছেন

তাফসীর মাআলেমুত তানযীলে উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল এরূপ লেখা হয়েছে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, কখনও সফরে বের হলে একেকজন নিঃস্ব নিঃসম্বল গরীবকে দুই দুই জন ধনাঢ্য বক্তির সঙ্গী করে দিতেন। যাতে নিঃসম্বল ব্যক্তি ধনাঢ্য ব্যক্তিদ্বয়ের সেবা পরিচর্যা করতে পারে এবং ধনাঢ্যরা এ গরীবের প্রয়োজন পূরণ করবে। সুতরাং এক সফরে তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে দুই ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গী করে দেন। পথিমধ্যে একদিন মনযিলে অবতরণ করলে ধনী ব্যক্তিদ্বয় কোন কাজে চলে যান এবং সালমান (রাঃ) ঘুমিয়ে পড়েন। তারা দুই জন কাজ শেষে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে সালমান! খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি? তিনি বললেন, আমার ঘুম এসে গেছে, তাই কিছুই প্রস্তুত করতে পারিনি। তারা বললেন, যাও! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু খাদ্য খাবার চেয়ে আন। হযরত সালমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমার ভাণ্ডার রক্ষক ওসামার নিকট যাও এবং কিছু থাকলে

নিয়ে আস। তিনি হযরত ওসামা (রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, আমার নিকট দেবার মত কিছুই নেই। হযরত সালমান (রাঃ) ফিরে গিয়ে তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে এ জবাব অবহিত করেন। এ শুনে তাঁরা হযরত ওসামা (রাঃ)-এর গীবত করেন। বললেন, তার কাছে খাদ্য খাবার ছিল, কিন্তু সে কার্পণ্য করেছে। অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ)-কে বললেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নিকট যাও, যদি থাকে কিছু নিয়ে আস তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট রওয়ানা করে গেলে সঙ্গীদ্বয় তাঁরও কিছু গীবত শুরু করে দেন। এবারও হযরত সালমান (রাঃ) শূন্য হাতে ফিরে আসেন। তখন তাঁর সঙ্গীদ্বয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে গমন করেন। তিনি আগন্তুকদ্বয়কে বললেন, তোমাদের দাঁতে গোশতের রং লেগে রয়েছে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা মোটেই গোশত খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এ মাত্র ওসামা এবং সালমানের গোশত খেয়েছ। কেননা, তোমরা উভয়ের গীবত করেছ। আর কারো গীবত করা তার গোশত খাওয়ার নামান্তর। তখনই হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الخ—তোমরা একে অন্যের গীবত করো না— এ আয়াতের ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হন।

গীবতকে গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনার কারণ

কোরআনের আয়াত এবং হাদীসসমূহে গীবতের তুলনা গোশত ভক্ষণের সাথে করা হয়েছে। এর দুই কারণ— প্রথমতঃ কারো গোশত ভক্ষণে যেমন তাকে চরম হেয় অপদস্থ করা হয়, অনুরূপ গীবত দ্বারাও তার সম্মান মর্যাদা চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়। সুতরাং যখন কারো গীবত করা হল তখন যেন তার গোশতই ভক্ষণ করা হল। এ কারণে গীবতকে গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এ উপমা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ মানুষের বা কোন মৃত জীবের গোশত ভক্ষণ যেমন মানব প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সবাই তা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তেমনি গীবতও অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয়। তাই প্রত্যেকেরই স্ব স্ব রসনা অন্যের গীবত হতে প্রতিরুদ্ধ করে রাখা আবশ্যক।

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

৫

প্রথম ঘটনা— যায়দ (রাঃ)-এর গীবত

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশে সাহাবায়ে কেরামের থুথু নিক্ষেপ

একদিন হযরত যায়দ বিন সাবেত (রাঃ) মসজিদে নববীতে বসে মানুষজনকে ওয়াজ নসীহত করছিলেন। ইত্যবসরে কোথাও থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু গোশত হাদিয়া আসে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত যায়দ (রাঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে যাও এবং আমাদের জন্য কিছু গোশত নিয়ে আস। তাঁদের কথামত হযরত যায়দ (রাঃ) গোশত আনতে গমন করেন। তিনি চলে গেলে তাঁকে প্রেরণকারী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর গীবত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী অথবা এলহামের মাধ্যমে এ গীবত করার কথা জেনে ফেলেন। হযরত যায়দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহাবায়ে কেরামের জন্য গোশত প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, তারা সবেমাত্র গোশত খেয়েছে। হযরত যায়দ (রাঃ) ফিরে গিয়ে গোশত আকাঙ্ক্ষী সাহাবায়ে কেরামকে এ জবাব শুনান। তাঁরা বললেন, আমরা কয়েকদিন থেকেই গোশত মুখে তুলিনি। এ কথায় হযরত যায়দ (রাঃ) পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে গমন করে সাহাবায়ে কেরামের কথা তাঁকে শুনান। তিনি এবারও পূর্বেকার জবাবই দেন। দুই তিন দফা এরূপ ঘটার পর স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তাঁদেরকে উদ্দেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন— তোমরা সবেমাত্র যায়দের গোশত ভক্ষণ করেছ— তার গীবত করেছ। তোমরা থুথু ফেল। তোমাদের মুখ থেকে গোশতের নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তাঁরা যখন থুথু ফেললেন, দেখলেন, সত্যই থুথুর সাথে রক্তের লালিমা মিশে রয়েছে। —(তাম্বীহুল গাফেলীন)

দ্বিতীয় ঘটনা— সাহাবায়ে কেরাম

অন্যের গীবত করায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অসন্তুষ্টি

একদিন কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় একজন মজলিস থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে যান। তাঁর প্রস্থানের পর মজলিসে উপস্থিতগণ তাঁর সম্পর্কে

বললেন, সে দুর্বল, একেবারেই শক্তিশূন্য। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা তার গীবত করেছ।

—(আবু লায়লার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া)

তৃতীয় ঘটনা— মায়েয (রাঃ)-এর গীবত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মায়েয (রাঃ)-এর প্রশংসা

হযরত মায়েয আসলামী (রাঃ) যেনায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে যেনায় জড়ানোর স্বীকারোক্তি করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়েয (রাঃ)-কে পাথর নিক্ষেপ করে করে হত্যার নির্দেশ দেন। উপর্যুপরি পাথর নিক্ষেপের ফলে হযরত মায়েয (রাঃ) চিরস্থায়ী জান্নাতের যাত্রী হলে দুই ব্যক্তি তাঁর গীবত করেন। বললেন, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রেখেছিলেন, অথচ সে নিজেই তা প্রকাশ করে দিল। যেভাবে পাথর নিক্ষেপে কুকুর নিহত হয়, সেও তেমনি নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গীবত শুনতে পান। কিছুক্ষণ পর পথে একটি মৃত গাধা পাওয়া গেল। সেটি মরে এমনভাবে পচে গিয়েছিল যে, এক পা উপরে উঠে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত গাধাটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কোথায়? সম্বোধিতরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই যে আমরা উপস্থিত রয়েছি। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা যে সবেমাত্র মায়েযের গীবত করলে, তার বিনিময়ে এ মৃত গাধা ভক্ষণ কর। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ গোশত কে খেতে যাবে? তিনি বললেন, তোমরা যে সবেমাত্র মায়েযের গীবত করেছ, তা এর চেয়েও ভয়ংকর। তাতে এর চাইতেও বেশী গোনাহ রয়েছে। আল্লাহর কসম, মায়েয জান্নাতের নহরসমূহে ডুবাচ্ছে এবং জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণ করছে।

—(আবু দাউদ—রজম অধ্যায়)

মোনাফেকদেরকে মুসলমানদের গীবত করতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিষেধ

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণদানকালে উচ্চ স্বরে বলছিলেন—

يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ بِقَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحُهٗ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهٖ–

— হে লোকসকল! যারা মুখে ঈমান গ্রহণ করেছ, কিন্তু অন্তর ঈমানশূন্য, তারা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না, তাদের দোষ বর্ণনা করো না, লজ্জিত করো না, তাদের গীবত করো না, দোষ অন্বেষণ করো না। যে কোন মুসলমানের দোষ অন্বেষণ করে ফিরবে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ অন্বেষণ করবেন, তাকে লজ্জিত অপমানিত করবেন, যদিও সে নিজ ঘরে লুকিয়ে অবস্থান করুক। —(তিরমিযী—তাযীমিল মোমেন অধ্যায়)

হাশর ময়দানে অন্যের গীবতকারী এবং অধিকার হরণকারীদের অবস্থা

কেয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, তখন সবাই কঠোর গরমে ঘামসিক্ত হবে আর নিজের গোনাহের কথা খেয়াল করবে। সেদিন খোজখবর নেবার, সমবেদনা প্রকাশের কেউ থাকবে না। বরং মেয়ে মা থেকে, ছেলে বাপ থেকে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে পালাবে। সবার থেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার আওয়াজ ধ্বনিত হবে। সব দিক থেকেই শোর চীৎকার হৈহল্লার আওয়াজ কর্ণকুহরে ভেসে আসবে। সামনে জাহান্নাম ফুঁসতে থাকবে। প্রত্যেক দাবীদারই তার অধিকার দাবী করে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে। কেউ বলবে, এ লোক আমার গীবত করেছে, আমার দুর্নাম করেছে। কেউ বলবে, এ লোক আমার উপর জুলুম করেছে, কেউ বলবে, সে আমাকে আহমক বেওকুফ ভেবেছে, কেউ বলবে, সে আমাকে হত্যা করেছে। যাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত সব অভিযোগ উঠবে, তাদের সবাইকে ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করবেন। তারা লজ্জায় অনুশোচনায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখবে। যাদের তারা দোষ প্রকাশ করেছে, বর্ণনা করে ফিরেছে, তারা আজ দোষ প্রকাশকারী ও বর্ণনাকারীদের আঁচল টেনে ধরবে। মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারের আসনে আসীন হবেন। তিনি প্রত্যেক দাবীদারকেই সন্তুষ্ট করবেন। অভিযুক্তদের পুণ্যসমূহ অভিযোগ-কারীদেরকে দেবেন, তাদের অপরাধগুলো অভিযুক্তদের আমলনামায়

লেখবেন। অতঃপর কখনও আল্লাহর রহমত হলে তবে নাজাত পাবে। নতুবা এক দীর্ঘকাল জাহান্নামে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হতে থাকবে।

গীবত যেনার চাইতে ভয়ংকর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا —গীবত যেনার চাইতেও ভয়ংকর। মানুষ যেনাকে যেমন অন্যায় মনে করে, গীবতকেও তেমনি মনে করা উচিত।

—(ইবনে আবিদ্দুনইয়ার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া)

যেনার চাইতেও গীবত ভয়ংকর হওয়ার কারণ— যেনা দ্বারা শুধু রহমানুর রহীম আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে শয়তানের অনুগমন অনুসরণ করা হয়। পক্ষান্তরে গীবতে দুইটি ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ, দ্বিতীয়তঃ যার গীবত করা হচ্ছে তাকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহর অধিকার তো 'তওবা' দ্বারা মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার অধিকার মাফ হবে না। অর্থাৎ, কারো কৃত গোনাহের সাথে যদি বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন— কারো গীবত করা, কাউকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। এসব অপরাধ সংঘটনের পর তওবা করলে আল্লাহ তাআলা করুণাবশতঃ নিজের অধিকার তো মাফ করে দেন, কিন্তু বান্দা মাফ করে না দেয়া পর্যন্ত বান্দার হক মাফ হবে না।

এ কারণে কিছু কিছু আলেমের অভিমত, হজ্জ দ্বারা যত সগীরা কবীরা গোনাহ সবই মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক মাফ হবে না, যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা স্বয়ং মাফ না করে দেবে। আর কেয়ামতে অধিকারের দাবীদাররা সবাই তাদের দাবীর জন্য আঁচল টেনে ধরবে। এ আলোচনা থেকে জানা গেল, যেনার চাইতে গীবতের গোনাহ বেশী। কেননা, যেনাকার যাবতীয় শর্ত পালন করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে তাকে মাফ করে দেন। পক্ষান্তরে গীবতকারী লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে যদিও আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন, কিন্তু সে ভারমুক্ত হবে না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে। যার গীবত করা হল সে মাফ না দিলে কেয়ামতের দিন গীবতকারীর পিছু নেবে, তার আঁচল টেনে ধরবে। এ সময় গীবতকারীর কোন সাহায্য সহায়তাকারী থাকবে না। তখন সে বিনয় সহকারে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন—

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ —আজকে প্রত্যেকেই নিজের আমল মোতাবেক বিনিময় প্রাপ্ত হবে, কারো প্রতি জুলুম হবে না।

আল্লাহর এ ঘোষণা শুনে গীবতের অপরাধ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী অত্যন্ত নিরাশ এবং লজ্জিত অনুতপ্ত হবে। বলবে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমরা গীবত না করতাম, কারো দোষ প্রকাশ না করতাম।

চতুর্থ ঘটনা

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) কিছু লোককে দাওয়াত করেন। দাওয়াতকৃতরা দস্তরখানে খেতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দেয়। ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) বললেন, আগের কালে মানুষ আগে রুটি পরে গোশত খেত। এখন তো তোমরা রুটির আগে মানুষের গোশত খেতে শুরু করেছ— মানুষের গীবত করছ। —(তাযকেরাতুল আওলিয়া)

পঞ্চম ঘটনা—

এক যুবকের ইবনুল মোবারকের নিকট যেনার স্বীকৃতি— ইবনুল মোবারকের জবাব

এক যুবক হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রঃ)-এর সমীপে এসে বলতে লাগল, আমি অবর্ণনীয় এক বিরাট গোনাহ করেছি। তিনি বললেন, বল কি গোনাহ করেছ? যুবক বলল, আমি যেনা করেছি। হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! তুমি গীবত তো করনি। কেননা, গীবত যেনার চাইতেও বৃহৎ গোনাহ। —(তাযকেরাতুল আওলিয়া)

ষষ্ঠ ঘটনা— শেখ সাদী (রঃ)-এর পিতার হিতোপদেশ

হযরত শেখ সাদী (রঃ) তাঁর গোলেস্তাঁ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখেন, কিশোর বয়সে আমি রাত দিন এবাদতে মগ্ন থাকতাম এবং সদা সর্বদা কোরআন শরীফ সাথে রাখতাম। এক রাতে আমি আব্বার কাছে ছিলাম। তখন একদল মানুষ পড়ে ঘুমাচ্ছিল। আমি আব্বাকে বললাম, লোকগুলোর কি হয়েছে? এমনভাবে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে, যেন তারা মরে গেছে। যদি এরা জাগ্রত হয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করত! আমার এ খেদোক্তিতে আব্বা বললেন, প্রিয় বৎস! এ সময় তুমিও যদি এবাদতে রত না থেকে

ঘুমিয়ে কাটাতে তা হলে ভাল ছিল, তা হলে এ গীবত থেকে বাঁচতে পারতে। অন্যের দোষ বর্ণনা থেকে মুক্তি পেতে।

সপ্তম ঘটনা—

হজ্জের সফরে গীবত অত্যন্ত গোনাহ

'রওযা' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, হযরত আবুল লায়স বোখারী (রঃ) এক বছর হজ্জের উদ্দেশে বের হন এবং নিজের পকেটে মাত্র দুই দেরহাম লন। অতঃপর কসম করেন, আমি হজ্জে গমনের পথে যদি কারো গীবত করি তবে এ দুই দেরহাম আল্লাহর রাহে দিয়ে দেব। তিনি হজ্জ থেকে ফেরার পরও পকেটে সেই দুই দেরহাম রয়ে যায়, যা তিনি গমনকালে পকেটে নিয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি হজ্জে গমনাগমনের পথে কারো গীবত করিনি। কেননা, আমার মতে একবার গীবত করার চাইতে একশ'বার যেনা করা উত্তম। —(খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

অষ্টম ঘটনা—

গীবত যেনার চাইতে নিকৃষ্ট গোনাহ

এক মহিলা এক মাদরাসায় এসে মাদরাসা প্রধানকে বলল, আমি এক মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু লজ্জার কারণে তা মুখে আনতে পারছি না। মাদরাসা প্রধান বললেন, তোমার মাসআলা বর্ণনা কর, লজ্জা করো না। তখন মহিলা বলল, আমি যেনা করেছি এবং গর্ভ ধারণ করেছি। অতঃপর যেনার ফসল যে ছেলে জন্ম নিয়েছে, তাকে হত্যা করেছি। এ বর্ণনা শুনে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়। মাদরাসা প্রধান বললেন, হে লোকসকল! তোমরা এ গোনাহে বিস্ময় প্রকাশ করছ! হৃদয়ঙ্গম করে নাও, গীবতের গোনাহ এর চাইতেও বড়। কেননা, যেনাকার গোনাহ হতে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে নেন। আর গীবতকারী তওবা করলেও আল্লাহ তাআলা তাকে গোনাহের দায় মুক্ত করেন না, যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ করে। —(খাযানাতুর রেওয়ায়াত— রওযা হতে)

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোআয রাযী (রঃ)-এর হিতোপদেশ

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোআয রাযী (রঃ) বলেন—

لُكِنْ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلٰثُ خِصَالٍ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ أَحَدُهُمَا إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَنْفَعْهُ فَلَا تَضُرَّهُ وَالثَّانِيْ إِنْ لَمْ تَسُرَّهُ فَلَا تَغُمَّهُ وَالثَّالِثُ إِنْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلَا تَذُمَّهُ-

— হে মুসলমান! তোমার থেকে অন্য মুসলমান তিনটি উত্তম আচরণ পাওয়া অত্যাবশ্যক। তা হলে তুমি নেক্কার পুণ্যশীলদের মাঝে গণ্য হবে। এক— তুমি কারো উপকার না করলেও ক্ষতি করো না; দুই— কাউকে সন্তুষ্ট আনন্দিত করতে না পারলেও অন্ততঃ তাকে চিন্তাক্লিষ্ট করো না; তিন— কারো প্রশংসা স্তুতি করতে না পারলেও অন্ততঃ নিন্দাবাদ করো না।

তোমার মাঝে যদি উক্ত তিনটি বিষয় পাওয়া যায় তবে তুমি নেককার পুণ্যশীলদের মাঝে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে সওয়াব দান করবেন, তোমাকেও তাই দান করবেন। এ না করে যদি তুমি মানুষের উপর জুলুম কর, তাদেরকে কষ্ট দাও, তাদের অধিকার নষ্ট কর, তাদের কোন কাজে সহযোগিতা সহায়তা না কর, গীবত কর, তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দাও, তাদের দোষত্রুটি জনসমক্ষে প্রচার কর, হেয় অপদস্থ কর, মিথ্যা অপবাদ দাও, তাদেরকে চিন্তাক্লিষ্ট কর, সর্বপ্রকারে তাদেরকে দুঃখ কষ্ট দাও, তা হলে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা জালেমদের জন্য যে প্রতিফল নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই তোমার ভাগ্যে ঘটবে। জাহান্নাম তোমার জন্য আগ্রহী হবে। জান্নাত তোমা হতে বহু যোজন দূরে পলায়ন করবে।

যাদেরকে তুমি কোন না কোনভাবে কষ্ট দিয়েছ, গীবত করেছ, জুলুম করেছ, চিন্তাক্লিষ্ট করেছ, ক্ষতিগ্রস্ত করেছ, হেয় প্রতিপন্ন করেছ, অপমান অপদস্থ করেছ, অধিকার বিনষ্ট করেছ, হাশরের দিন তারা যথার্থ ন্যায়বিচারক মহান আল্লাহর দরবারে অভিযোগ দায়ের করে তোমাকে হেয় অপদস্থ করাবেন। তাই কেয়ামতের দিন বিপুল জনসমাবেশে নিজেকে অপমান অপদস্থ করতে চাইলে দুনিয়ায় মানুষের গীবত কর, তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর, হেয় প্রতিপন্ন কর। আর যদি তা না চাও, পছন্দ না কর, তা হলে নিজের অন্যায় গর্হিত কর্ম থেকে বিরত হও। মানুষকে কোন প্রকারে কষ্ট দিও না। কারো গোপন দোষ প্রকাশ করো না। —(তাম্বীহুল গাফেলীন)

পরিপূর্ণ মুসলমানের পরিচয়

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ —পরিপূর্ণ মুসলমান সে, যার হাত এবং মুখ হতে মুসলমান নিরাপদ।

উল্লিখিত হাদীসের শিক্ষার সারকথা হচ্ছে, মুখে কাউকে গালি দেবে না, মন্দ বলবে না, কারো গীবত করবে না, কাউকে বেওকুফ আহমক ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করবে না। কাউকে পাগল উদ্ভ্রান্ত বলবে না। কারো দোষ প্রকাশ করবে না, কারো গোপন বিষয় অন্বেষণ করবে না, প্রকাশ করবে না। হাতে কাউকে কষ্ট দেবে না, কাউকে মারধর করবে না, কাউকে হাতের লক্ষ্যবস্তু বানাবে না, কারো গায়ে হাত তুলবে না।

যে উল্লিখিত রূপ অভ্যাস আচরণ করবে না, সে মানুষকে সর্বপ্রকারে কষ্ট দিল। সে কাউকে মারতে উদ্যত হল, অসম্মান করার উদ্দেশে অঙ্গুলি নির্দেশ করল, চোখে কারো প্রতি উদ্দেশ্যমূলক ইঙ্গিত করল, সব মানুষই তার দ্বারা উত্ত্যক্ত হতে থাকল, তবে এরূপ ব্যক্তি পূর্ণ মুসলমান নয়। তার অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে স্থিত হতে পারেনি। এরূপ ব্যক্তির মরণকালে শয়তান তার উপর বিজয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এ কঠিন সময়ে শয়তান তার সর্বপ্রকার কৌশল প্রয়োগে তাকে প্রতারিত প্রবঞ্চিত করবে। ফলতঃ হয়ত সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে দ্বীনের সরল সহজ পথ হতে পদস্খলিত হয়ে জাহান্নামের রাস্তা নেবে।

বিপরীতপক্ষে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হলে সে অন্তরে দ্বীন ইসলামের পূর্ণ স্বাদ লাভ করবে। তার মাঝে ঈমানের দাবীর অনুরূপ কর্ম পাওয়া গেলে, তার ঘাড়ে বান্দার হক না থাকলে মৃত্যুকালে শয়তানের ধোকা প্রবঞ্চনা তার উপর প্রভাবশীল হবে না। তখন ঈমানের দরিয়া ফুঁসে উঠবে। ফেরেশতা ইবলীসকে ভাগিয়ে তার ধোকা প্রবঞ্চনা দূরীভূত করে দেবে, তাই তার জীবনের কল্যাণকর উত্তম পরিসমাপ্তি ঘটবে। এরূপ মুসলমানকে প্রবঞ্চিত প্রতারিত না করতে পেরে শয়তান নিজে নিজের মাথা পেটাবে, দুঃখে ক্ষোভে নিজের শিরোপরি ধুলাবালু ছড়াবে, চীৎকার করবে।

—(বোখারী—ঈমান অধ্যায়)

গীবত সম্পর্কে হযরত কাবে আহবার (রঃ)-এর উক্তি

হযরত কাবে আহবার (রঃ) বলেন, আমি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের গ্রন্থসমূহ পড়েছি। সেসব গ্রন্থে গীবত সম্পর্কে লেখা রয়েছে—

مَنْ مَاتَ تَائِبًا مِنَ الْغِيْبَةِ كَانَ اٰخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا كَانَ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ۔

— যে গীবত হতে তওবা করে মৃত্যুবরণ করবে সে সর্বশেষে জান্নাতে, আর যে গীবতের উপর হঠকারিতা করে তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করবে, সে সর্বাগ্রে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। —(কিমিয়ায়ে সাআদাত)

সারকথা, গীবতকারীর ক্ষতি ব্যতীত লাভ কিছুই হয় না। যদি তওবা করে মরে, তওবার কারণে কেয়ামতে যদিও তাকে আযাব দেয়া হবে না, কিন্তু সে তিরস্কৃত হবে এবং সবার পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা জান্নাতে যাবে, তাদের সবাই প্রবেশ করার আগে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এর পরে অনুশোচনা করবে, পস্তাবে, লজ্জিত হবে। দুঃখে লজ্জায় হাতের উপর হাত মারবে। যদি তওবা ব্যতীতই এ নশ্বর জগত হতে অবিনশ্বর জগতের প্রতি পাড়ি জমানো হয়, তা হলে কেয়ামতে সর্বাগ্রে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যদিও হৈচৈ, শোরগোল, চীৎকার, কান্নাকাটি সেখানেই অনেকই হবে। এসব তখন কোন কাজেই আসবে না। আল্লাহর ক্রোধের সামনে কিছুই কাজে লাগার নয়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘোষণা— গীবত রোগ

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন— عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ شِفَاءٌ وَاِيَّاكَ وَالْغِيْبَةِ وَذِكْرُ النَّاسِ فَاِنَّهُ دَاءٌ —হে মানুষ! তুমি নিজের উপর আল্লাহ তাআলার স্মরণ আবশ্যক করে নাও। সব সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ কর। কেননা তাঁর স্মরণে সর্বরোগের নিরাময় ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। আর গীবত হতে আত্মরক্ষা কর। অন্যের দোষ বর্ণনা করো না। কেননা গীবত রোগবিশেষ। —(এহইয়াউল উলূম)

গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, لَا تَلْمِزُوٓا اَنْفُسَكُمْ —কেউ কারো গীবত করবে না এবং ভর্ৎসনা তিরস্কার করবে না।

কেয়ামতে গীবতকারীর সাথে যে ব্যবহার করা হবে

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন—

مَنْ اَكَلَ لَحْمَ اَخِيْهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ اِلَيْهِ لَحْمُهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَقِيْلَ لَهٗ كُلْهُ مَيْتًا كَمَا اَكَلْتَهٗ حَيًّا فَيَاْكُلُهٗ فَيَفْضَحُ وَيَكْلَحُ

— যে দুনিয়ায় নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে — গীবত করেছে, আখেরাতে গীবতকারীর সামনে তার ভাইয়ের গোশত উপস্থাপন করা হবে। তাকে আদেশ করা হবে, যেভাবে দুনিয়ায় তুমি তার গোশত খেয়েছ—গীবত করেছ, এখনও অনুরূপ তার গোশত খাও। গীবতকারী সে গোশত মুখে পুরতেই তার মুখ বিকৃত হবে, আর এতে সে অপমানিত অপদস্থ হবে।

—(আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর হিতোপদেশ

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন—

كَمَا يَمْتَنِعُ اَحَدُكُمْ مِنْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا كَذٰلِكَ يُحِبُّ يَمْتَنِعُ مِنْ غِيْبَتِهٖ حَيًّا

— মানুষ যেমন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে অপছন্দ করে, অনুরূপ নিজেকে গীবত থেকে বিরত রাখাও ওয়াজিব।

—(সোলায়মান জুমাল—হাশিয়ায়ে জালালাইন)

কবরের এক তৃতীয়াংশ আযাব গীবতের কারণে হয়

এহইয়াউল উলূম গ্রন্থে বলা হয়েছে—

عَذَابُ الْقَبْرِ ثُلُثٌ مِنَ الْغِيْبَةِ وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيْمَةِ وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ—

—তিন কারণে কবর আযাব হয়– এক তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে, এক তৃতীয়াংশ চোগলখোরীর কারণে, এক তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে আত্মরক্ষা না করার কারণে।

গীবত করা এবং মন্দ ধারণা পোষণ হারাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَعِرْضَهُ وَاَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ -

—কোন অধিকার ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্ত, তার জীবন, তার সম্পদ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। অতএব, কোন মুসলমানের সম্মানহানি করবে না, গীবত করবে না, তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণও হারাম।

এ হাদীস থেকে অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ হারাম প্রমাণিত হয় এবং এ যে একটা অত্যন্ত খারাপ কর্ম তাও জানা যায়। কোরআনের কিছু কিছু দ্ব্যর্থহীন আয়াত এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীসও অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ হারাম হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। অধুনা এ ব্যাপার অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে। কেউ মনে করে, অমুক আমার গীবত করে। কেউ ধারণা করে, অমুকে রোযা রাখে না। কারো দ্বারাই এ হয় না যে, কোন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তার অবস্থাটা জেনে নেই, যার সম্পর্কে আমি অনুমাননির্ভর ধারণা পোষণ করছি। আর একে অন্যের প্রতি এরূপ মন্দ ধারণা পোষণের কারণে ফাসাদ বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। পরস্পরে যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শয়তান যখন কারো অন্তরে অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টি হতে দেখে, তখন সে মন্দ ধারণা পোষণকারীকে সর্বপ্রকারে কুমন্ত্রণা দেয়। তার মনোজগতে সর্বপ্রকারের শংকা সৃষ্টি করে। পরিণতিতে তা দুষ্কৃতিপনায় উপনীত হয়।

নিম্নে গীবতের অপকৃষ্টতা অপকারিতা সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর উপদেশবাণী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উপদেশ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوْبَ صَاحِبِكَ فَمَا ذْكُرْ عُيُوْبَكَ —যখন তুমি তোমার কোন সতীর্থ বন্ধুর গীবত করতে ইচ্ছা করবে, তখন নিজের দোষের কথা স্মরণ কর। নিজের গোনাহসমূহ সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা কর। তা হলে গীবত থেকে নাজাত পাবে এবং জান্নাতে যাবে। যদি নিজের দোষসমূহ না দেখে অন্যের দোষ আঁকড়ে ধর, তা হলে আল্লাহ তাআলাও কেয়ামতে তোমার দোষসমূহ প্রকাশ করে দেবেন। —(এহইয়াউল উলূম)

আয়াস বিন মোআবিয়া (রাঃ)-এর বিস্ময়কর উপদেশ

একদিন আয়াস বিন মোআবিয়া (রাঃ)-এর কাছে সুফিয়ান বিন হোসাইন বসা ছিলেন। এ সময় তিনি কারো গীবত এবং দুর্নাম করেন। তখন আয়াস তাকে বললেন, চুপ থাক। অতঃপর বললেন, ভাল কথা! হে সুফিয়ান! তুমি কি কখনো তুর্কীদের সাথে লড়াই করেছ। তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো রোমকদের সাথে লড়াই করেছ? এবারও সুফিয়ান জবাব দিলেন, না। তখন আয়াস বললেন, আফসোস! তোমার হাতে তুর্কী বা রোমকরা কোন কষ্ট পায়নি, পক্ষান্তরে তুমি যে মুসলমানের গীবত করেছ, সে কষ্ট পেয়েছে। —(তাম্বীহুল গাফেলীন)

হযরত যয়নুল আবেদীন (রঃ)-এর উপদেশ

হযরত যয়নুল আবেদীন আলী বিন হোসাইন (রঃ) এক ব্যক্তিকে গীবত করতে শুনে এরশাদ করলেন, إِيَّاكَ وَالْغِيْبَةَ فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّاسِ —তুমি গীবত থেকে বাঁচ। কেননা, গীবত সেসব লোকের তরকারি যারা (স্বভাবে) কুকুর। হযরত যয়নুল আবেদীন (রঃ) তাঁর বাণীতে ادام শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা দ্বারা রুটি খাওয়া হয় তাকে ادام বলে। যেমন— সুরুয়া, লবণ ইত্যাদি। —(কিমিয়ায়ে সাআদাত)

কুকুরের সাথে উপমা দেয়ার কারণ

হযরত যয়নুল আবেদীন (রঃ) গীবতকারীদেরকে কুকুরের সাথে উপমা দেয়ার কারণ, কোরআন এবং হাদীসে গীবতকে মৃতের গোশত ভক্ষণ বলা হয়েছে। এতে গীবতের উপমা মৃতের গোশত ভক্ষণের সাথে সংস্থাপিত

হয়েছে। মৃতের গোশত ভক্ষণ, তা চিবানো কুকুরের কাজ। সুতরাং গীবতকারী কুকুরের অনুরূপ সাব্যস্ত হল। এতে সে মানব প্রজাতি বহির্ভূত হয়ে গেল। কেননা, মানুষ হলে তাদের মধ্যে মানুষের গুণ বৈশিষ্ট্য থাকত, মানব স্বভাব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হত, কারো গীবত করত না, কুকুরের মত কারো গোশত চিবাত না। কাউকে ঠাট্টা উপহাস করত না। একে রুটির সুরুয়া এবং লবণ বানাত না।

হযরত আবু এমরান (রঃ)-এর উপদেশ—
গীবত ফাসেক পাপাচারীর মেহমানদারী

হযরত আবু এমরান (রঃ) বললেন—

اَلْغِيْبَةُ ضِيَافَةُ الْفُسَّاقِ وَمَرَاتِعُ النِّسَاءِ وَاِدَامُ كِلَابِ النَّاسِ وَمَزَائِلُ الْاَتْقِيَاءِ

— গীবত ফাসেক পাপাচারীদের মেহমানদারী এবং নারীকুলের চারণভূমি, মানুষ কুকুরদের তরকারি এবং আল্লাহভীরুদের দূরত্ব অবলম্বনের ক্ষেত্র।

গীবত ফাসেক পাপাচারীদের মেহমানদারী— এ উক্তির মর্ম হল, ফাসেক পাপাচারীরা একত্রিত হলে গীবতের বাজার জমে। বর্তমানকালে সাধারণ মানুষ কেন, বিশিষ্ট জনরাও যখন খেতে বসে তখন প্রচুর ভৌতিক গল্প-কাহিনী বর্ণনা করে (যা সাধারণতঃ গীবতে পরিপূর্ণ থাকে) এবং বিসমিল্লাহ বলে মানুষের গোশত ভক্ষণ শুরু করে। খাওয়ার সময় দ্বীনী গল্প কাহিনী এবং নেককার পুণ্যবানদের কাহিনী উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইহজাগতিক গল্প-কাহিনী আলোচনায় লেগে যায়।

একে অন্যের সাথে মিলিত হলে মানুষের গীবত দ্বারা পরস্পরের মেহমানদারী করে। মুসলমানদের দোষত্রুটি প্রকাশ করে করে তাদেরকে অপমান অপদস্থ করে। দ্বীনী আলোচনায় তাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। গীবত দ্বারাই তাদের মন সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং গীবত ফাসেক পাপাচারীদের মেহমানদারী প্রতিপন্ন হল।

গীবত রমণীকুলের চারণভূমি

গীবত রমণীকুলের চারণভূমি— এ উক্তির মর্ম হল, চতুষ্পদ জীবকুল যেমন ঘাস পেলে খুশী হয়ে সে দিকে দৌড়ায়, সর্বদা দৃষ্টি রাখে কোথায় ঘাস পাওয়া যায়, কোথায় খাদ্য খাবার ভাগ্যে জোটে, অনুরূপ রমণীকুলও

যখন দেখতে পায় কোন মজলিসে কারো গীবত হচ্ছে, তা হলে ঝটপট গিয়ে শরীক হয় আর অট্টহাসি হাসে। নিজেও দুই চার কথা উপস্থিতদেরকে শুনায়। তারা যখন কোথাও একত্রিত হয়, তখন সেখানে মানুষের দোষ আলোচনা শুরু হয়, হৈহল্লা উঠে, প্রত্যেকেই একেক কাহিনী বর্ণনা করে, কারো দোষ বর্ণনা ও প্রকাশ করে।

পূর্বকালে কিছু কিছু রমণী এমন ছিল, যারা নিয়মিত এশরাক এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়ত। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে তসবীহ তাহলীল পড়ত। যথাসাধ্য মানুষের দোষ বর্ণনা ও প্রকাশ থেকে নিজেদের রসনা প্রতিরুদ্ধ করে রাখত। দ্বীনের সরল সঠিক পথের উপর জীবন যাপন করত। কেউ কারো গীবত করলে, দোষ বর্ণনা বা প্রকাশ করলে তাকে এ গর্হিত কর্ম থেকে বিরত থাকার হিতোপদেশ দিত। পুরুষ নারী নির্বিশেষে সবাইকে অন্যদেরকে হেয় প্রতিপন্নকরণ, অপমান অপদস্থকরণ হতে বিরত রাখত। দুঃখ পুরুষদের জন্য। তারা রমণীকুলের উপর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েও সর্বদা গীবত করে বেড়ায়।

পরন্তু উপরে আলোচিত হয়েছে, গীবত কুকুর স্বভাব মানুষের তরকারি। পক্ষান্তরে আল্লাহভীরু পুণ্যবান মানুষদের নিকট গীবত আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানসম। যেমন— আবর্জনা নিক্ষেপের স্থান খুবই খারাপ, মানুষ সব সময় এরূপ স্থান থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। তাই আল্লাহভীরু পুণ্যশীল মানুষরা সর্বদা নিজেদের রসনা অন্যের গীবত হতে প্রতিরুদ্ধ করে রাখেন।

—(নুযহাতুল মাজালেস)

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কখনো গীবত করেননি

মোসনাদে ইমাম আযম গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন হামূদুল আরাবী আলখাওয়ারেযমী লেখেন— ইমাম আযম (রঃ) বিস্ময়কর স্বভাব বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো কারো গীবত করেননি, নিন্দাবাদ করেননি।

জাহান্নামে গীবতকারীদের খুজলী হবে

জাহান্নামে গীবতকারীদের ভীষণ খুজলী হবে। খুজলীর কারণে তাদের গোশত চামড়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। হাড় বেরিয়ে আসবে। তখন ধ্বনিত হবে, হে লোকসকল! এ খুজলীর কারণে কি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে?

জাহান্নামীরা জবাব দেবে, হাঁ। তাদেরকে জবাব দেয়া হবে, তোমাদের এ কষ্টের কারণ, দুনিয়ায় তোমরা মানুষদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে, অপমান অপদস্থ করতে, মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ الخ আয়াতের তাফসীর

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ —অভিশাপ সে লোকের উপর যে হুমাযাও লুমাযা এবং সম্পদ একত্রকারী।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে তাফসীরবিদ মনীষীদের প্রথম মতভেদ — এ আয়াত ব্যাপক না কি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিছু কিছু তাফসীরবিদ মনীষীর মতে এ আয়াত ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে নাযিল হয়েছে। তাফসীর গ্রন্থ জালালাইনে লেখা হয়েছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মোমেনদের গীবত করত। যেমন— ওলীদ বিন মুগীরা প্রমুখ। কালবী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এ আয়াত আখনাস বিন শোরায়কের উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়েছে সে সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের কুৎসা রটনা করে নিজের সময় অপচয় করত। কিছু কিছু তাফসীরবিদ মনীষীর মতে হুমাযা ও লুমাযা দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয় এবং এ আয়াতও কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়নি। বরং হুমাযা ও লুমাযা বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উদ্দেশ করা হয়েছে, যারা অন্যের গীবত করে। কারখী (রঃ) মুজাহিদ (রঃ)-এর সূত্রে এ অভিমত উদ্ধৃত করেছেন এবং সত্যনিষ্ঠ মনীষীদের অভিমতও এটাই।

তাঁদের মতে, এ আয়াত যদিও বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে অবতীর্ণ হয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গীবত করত। কিন্তু এ আয়াতের লক্ষ্য এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে গীবত করে। সে আখনাস বিন শোরায়ক বা ওলীদ বিন মুগীরা যে-ই হোক। আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। তাফসীরে কবীরে হযরত ইমাম রাযী (রঃ)-এর এদিকেই ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য আয়াত ব্যাপক না বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—এ মতভেদের পর তাফসীরবিদ মনীষীগণ হুমাযা এবং লুমাযার অর্থ নির্ধারণে মতভেদ করেছেন। কারো কারো মতে হুমাযা লুমাযা উভয় শব্দ দ্বারাই গীবতকারী বুঝানো হয়েছে। অতএব, জাওয়াহেরুত তাফসীর গ্রন্থে এ অভিমতই উদ্ধৃত হয়েছে।

কালবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হুমাযা শব্দ দ্বারা যে মানুষের পিছনে গীবত করে তাকে আর লুমাযা দ্বারা যে মানুষের সামনাসামনি লানত করে, গালি দেয়, তাকে বুঝানো হয়েছে। সোলায়মান জুমাল তাফসীরে জালালাইনের পার্শ্বটীকায় হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর সূত্রে এর বিপরীত অভিমত উল্লেখ করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে হুমাযা সে, যে মানুষকে সামানাসামনি গালি দেয় এবং লুমাযা হচ্ছে, যে মানুষের গীবত করে।

ইমাম রাযী (রঃ) তাফসীরে কবীর গ্রন্থে ইমাম আবু যায়দ (রঃ) -এর সূত্রে উল্লেখ করেন, হুমাযা সে, যে মানুষকে হাতে এবং লুমাযা সে, যে মুখে কষ্ট দেয়।

সারকথা, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা গীবতকারীদের উপর দুঃখ প্রকাশ এবং কঠোর ধমক প্রদান করেছেন। তাজ্জবের ব্যাপার! আল্লাহ তাআলার কঠোর ধমক সত্ত্বেও মানুষ গীবত করে তাঁর শাস্তির যোগ্য হচ্ছে।

তরীকতপন্থী দরবেশদের অভূতপূর্ব পন্থায় হিতোপদেশ

কয়েকজন দরবেশ একত্রে বসে আলাপ আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে একজন কারো গীবত শুরু করেন। এক দরবেশ গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে! তুমি কি কখনো ফিরিঙ্গীদের সাথে জেহাদ করেছ? সে জবাব দিল, যুদ্ধ জেহাদ তো দূরে, আমি জীবনে কখনা নিজের ঘরের চতুর্সীমা অতিক্রম করিনি। গীবতকারীর এ জবাবে প্রশ্নকর্তা দরবেশ বললেন, এমন দুর্ভাগা আর কে হবে, যার দ্বারা কাফেররা কষ্ট পেল না, অথচ যে মুসলমানের গীবত করলে, সে কষ্ট পেল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন— গীবত মোনাফেকী

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গীবত করতে শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে! যদি হাজ্জাজ এখানে উপস্থিত থাকত, তবে তুমি সামনাসামনি তার এ দোষ বর্ণনা করতে কি? সে বলল, না। তখন ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, মানুষের সামনে প্রশংসা এবং পিছনে দুর্নাম রটনা— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান থাকাবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম এ আচরণকে মোনাফেকী মনে করতেন।

—(এহইয়াউল উলূম)

বর্তমানকালের লোকদের মোনাফেকী

বর্তমানকালের লোকদের অবস্থা বিস্ময়কর। তারা পরস্পরে সাক্ষাত হলে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করে। ভাল-মন্দ অবস্থা জিজ্ঞেস করে। সর্বপ্রারে খাতিরদারী মেহমানদারী করে। বাহ্যিক তো এহেন হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করে। অথচ তাদের মন থাকে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তাই মজলিস শেষ হতেই গীবত শুরু করে দেয়। অন্যদের দোষ-ত্রূটি বর্ণনা করে হাসাহাসিতে লিপ্ত হয়। অমুক এমন এমন—পাপাচারী, দাড়ি মুণ্ডায়, অমুকের দাড়ি শরীঅত নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে কম, অমুকের কি হল কে জানে? সে সর্বদা রেশমী কাপড়ের পাজামা পরে। শরীঅত বিগর্হিত কথাবার্তা বলে। অমুকের চালচলন আজব ধরনের। তাকে দেখে হাসির উদ্রেক হয়। অমুক কেমন নির্লজ্জ। তার কথাবার্তায় আমরা লজ্জিত হই। অমুককে মনে হয় দাম্ভিক অহংকারী। অহংকারবশতই মানুষের সাথে কম কথাবার্তা বলে। অমুক নির্বোধ ধরনের। মানুষের সাথে কথাবার্তায় অসচেতন। অমুক আজব কৌতুকী, যেন হিজড়া। এসব লোককে যদি কেউ বলে, আরে! কেন অন্যের গীবত নিন্দাবাদ করছ? তখন জবাব দেয়, এতে ক্ষতি কি? রাজার অবর্তমানেও তো মানুষ তার গীবত করে।

কিছু লোকের সাথে আমার (গ্রন্থকার) আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, আমি মানুষের গীবতকারী দুর্নাম রটনাকারী কিছু লোককে বললাম, আপনারা তো দেখছি মানবিকতাশূন্য আজব মানুষ! সামনে মানুষের প্রশংসা স্তুতি করেন, তোষামোদ করেন। অথচ পশ্চাতে তাদের গীবত নিন্দাবাদ করেন। তারা জবাবে বলল, এরই নাম সচ্চরিত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন— إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ —হে নবী! আপনি মহৎ চরিত্রের উপর রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লিখিত রূপ প্রশংসা করার কারণ, তিনি মানুষের সামনে তাদেরকে মন্দ বলতেন না। তাই আমরাও মানুষের মুখের উপর মন্দ বলি না, যাতে তারা মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

আমি তাদেরকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন মুখের উপর মানুষকে মন্দ বলতেন না, তেমনি কারো গীবতও করতেন না। অবশ্য কোন উপকারিতা থাকলে ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে

আপনারা প্রকাশ্যে মানুষের প্রশংসা করেন আর মনে ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করেন। এ সচ্চরিত্র নয়; বরং মোনাফেকী।

ঠাট্টা কৌতুক গীবতের চাইতে উত্তম

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন, একবার জনৈক পরহেযগার ব্যক্তি এক বালকের সঙ্গে কিছু ঠাট্টা কৌতুক করেন। উদ্দেশ্য ছিল মানসিক প্রফুল্লতা লাভ। অন্যেরা যখন শুনতে পেল, অমুক বালকের সাথে ঠাট্টা কৌতুক করেছে, তখন তারা এ নিয়ে হাসাহাসি এবং গীবত করতে লেগে যায়। ক্রমে এ খবর প্রথমোক্ত পরহেযগার ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়। তখন তিনি বললেন, লোকসকল! আনন্দচ্ছলে বালকের সাথে ঠাট্টা কৌতুক আল্লাহ হারাম করেননি, অবশ্য গীবত হারাম করেছেন, কিন্তু কে তোমাদেরকে গীবতের অনুমতি দিয়েছে?

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন— গীবত মোনাফেকী

একদিন কিছু লোক হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর ঘরের দরজায় বসে তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। মধ্যখানে হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর আলোচনা আসে। তিনি বাইরে এলে অপেক্ষমাণ লোকেরা লজ্জায় চুপ হয়ে যান। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) তাদেরকে বললেন, কি বলছিলে— বল। মানুষের সামনে চুপ থাকা এবং অবর্তমানে প্রশংসা স্তুতি করা— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একে আমরা মোনাফেকী বলতাম।

—(এহইয়াউল উলূম—খাওফ অধ্যায়)

গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِءٍ وَمِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ

— সব মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের সম্পদ হারাম (সুতরাং কারো মাল চুরি করে নেয়া, ছিনিয়ে নেয়া, নষ্ট করা, খোয়ানো জায়েয নয়)। আর তার ইজ্জত সম্মানও হারাম (অতএব, কারো সম্মান হরণ করা, গীবত করা, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অপমান অপদস্থ করা নিষিদ্ধ। তার রক্তও হারাম (সুতরাং বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা অবৈধ—হারাম)। কেউ কাউকে

অপমান অপদস্থ করা, হেয় প্রতিপন্ন করা তো মহা অন্যায়। অর্থাৎ, একের দ্বারা অন্যের কোন কষ্ট হয় না বটে, তবে কেউ কাউকে যদি অপমান অপদস্থ এবং হেয় প্রতিপন্ন করে, তা হলে এটাই যথেষ্ট। — (আবু দাউদ)

উপদেশ

মানুষের অবশ্য কর্তব্য— একে অন্যকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা এবং তওবা করা। কেননা, বর্তমান যুগের লোকদের অবস্থা হচ্ছে, যদি কেউ কারো কোন উপকার করে বা কোন কাজ করে দেয়, তা হলে নিজের কৃত উপকার সহযোগিতার খোটা দেয়। মানুষের সামনে খোলামেলা বলে বেড়ায়— দেখ! আমি অমুকের এত উপকার করেছি। তার কোন ক্ষতি করিনি, তাকে কষ্ট দেইনি। অপর দিকে সকাল সন্ধ্যা তার গীবতে ব্যস্ত থাকে। তাকে অপমান অপদস্থ করে। এটাকে সে কষ্ট দেয়াই বুঝে না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অপমান অপদস্থ করাও কষ্ট দেয়াই বটে।

শেখ সাদী (রঃ)-কে তাঁর ওস্তাদের উপদেশ

নেযামিয়া মাদ্‌রাসায় একদিন শেখ সাদী (রঃ) তাঁর ওস্তাদ শামসুদ্দীন আবুল ফারজ ইবনে জাওযীকে বললেন, যখন আমি মানুষকে হাদীস শিক্ষা দেই, তখন অমুক ব্যক্তি ঈর্ষা করে এবং মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। ওস্তাদ বললেন, সাদী! তাজ্জবের বিষয়! তুমি ঈর্ষাকে এত বড় ভাবছ যে, তা আমার সামনে আলোচনা করছ। অথচ তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করছ। ঈর্ষা বিদ্বেষ হারাম আর গীবত হালাল— এটা তোমাকে কে বলল? তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণকারী ঈর্ষার কারণে যেমন জাহান্নামে যাবে, গীবতের কারণে তুমিও জাহান্নামে যাবে। —(বোস্তাঁ)

গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন—

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

— আর হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যে অধিক কসম খায়, হীন প্রকৃতির অপবাদ আরোপকারী, চোগলখোর, সৎকাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপী।

উল্লিখিত আয়াতে অপবাদ আরোপ, চোগলখোরী এবং অধিক কসম করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং সত্য হলেও কথায় কথায় কসম করতে হবে— এর কোন প্রয়োজন নেই; বরং কোরআনের বিধান মতে নিষিদ্ধ।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর হযরত ইউসুফ এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সাক্ষাত ঘটলে সে বাঘটি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে ধন্যবাদ জানাতে আসে, ইউসুফ ভ্রাতারা যেটির উপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ভক্ষণের অপবাদ দিয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বাঘকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইউসুফের অবস্থা কি তোমার জানা ছিল না? বাঘ বলল, সার্বিক অবস্থা এবং ইউসুফ ভ্রাতাদের আচরণ— সব কিছুই আমার জানা ছিল। কিন্তু গীবত এবং চোগলখোরী হবে— এ ভয়ে আমি তা আপনাকে বলিনি।

—(নুযহাতুল মাজালেস)

সমকালীন মানুষ ব্যাঘ্রের চাইতেও নিকৃষ্ট

সমকালীন লোকদের অবস্থা বিস্ময়কর। তারা সব সময় গীবত করে আপন ভাইদের গোশত ভক্ষণ করে। পক্ষান্তরে ব্যাঘ্রের মত নির্বোধ প্রাণীও গীবত, চোগলখোরী এবং দুর্নাম রটনা থেকে বেঁচে থাকে। অতএব, এরা হিংস্র প্রাণী ব্যাঘ্রের চাইতেও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হল।

হাদীসে বর্ণিত এক ভয়ংকর দৃশ্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

لَمَّا عَرَجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمَشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ . قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ النَّاسَ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ .

— যখন আমি মেরাজে গমন করি, তখন চলার পথে বিস্ময়কর, এবং অভূতপূর্ব ভয়ংকর দৃশ্যসমূহ অবলোকন করি। তন্মধ্য হতে একটি হল—

এক জায়গায় এক দল লোককে দেখতে পেলাম, তাদের নখগুলো তামার। তারা এ তামার নখ দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং বক্ষ আঁচড়াচ্ছে। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা দুনিয়ায় মানুষের গোশত খেত (গীবত করত)।

গীবত সম্পর্কে হযরত আসাম্ম (রঃ)-এর উপদেশবাণী

হযরত আসাম্ম (রঃ) বলেন—

اَلْمُغْتَابُ وَالنَّمَّامُ قِرَدُ اَهْلِ النَّارِ وَالْكَذَّابُ كَلْبُ اَهْلِ النَّارِ وَالْحَاسِدُ خِنْزِيْرُ اَهْلِ النَّارِ

— গীবতকারী ও চোগলখোর জাহান্নামে বানর, অত্যধিক মিথ্যাবাদী কুকুর এবং ঈর্ষা-বিদ্বেষপরায়ণ শূকর হবে।

গীবত হতে হযরত দাউদ তায়ী (রঃ)-এর নিষেধ

এক লোক হযরত দাউদ তায়ী (রঃ)-এর সামনে আরেক লোকের নিন্দা করে বলল, অমুক সুফী বেহুশ মাতাল হয়ে পড়ে আছে। তার সব কাপড়চোপড়ে বমি ভরা, তার চতুর্দিকে কুকুর বসা। হযরত দাউদ তায়ী (রঃ) লোকটির কথা শুনে কিছুটা চিন্তা করে বললেন, এ জন্য দয়ার্দ্র চিত্ত বন্ধু চাই, তা হলে সে বন্ধুর গীবত করবে না। — (বোস্তাঁ)

পূর্বকালের এক নবী (আঃ)-এর ঘটনা

পূর্বকালে এক নবী (আঃ)-কে স্বপ্নে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হল, ভোর বেলায় যে বস্তু প্রথম তোমার দৃষ্টিতে পড়বে তা খেয়ে নিবে। এর পর যা দৃষ্টিতে পড়বে তা লুকাবে। এর পর যা দৃষ্টিতে পড়বে তাকে আশ্রয় দেবে। এর পর যা দৃষ্টিতে পড়বে সেটিকে হতাশ নিরাশ করবে না এবং সেটির কথামত কাজ করবে। অতঃপর যা দৃষ্টিতে পড়বে তা থেকে পলায়ন করবে।

ভোরে নবীর দৃষ্টি পড়ে বিশাল এক পাহাড়ের উপর। এ দেখে তিনি বিস্মিত হন। তিনি ভাবতে লাগলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ— প্রথমে যা দেখবে খেয়ে নেবে! পরক্ষণেই ভাবলেন— আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেকই কাজ করা উচিত। সুতরাং তিনি যখন পাহাড় খেতে মনস্থ করলেন তখন তা

ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে লাগল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ বিশাল পাহাড় মিষ্ট সুস্বাদু গ্রাসে পরিণত হয় এবং তিনি এ সুস্বাদু গ্রাস খেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। এর পর তাঁর সামনে স্বর্ণের এক তশতরী আসে। যেহেতু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছিল, দ্বিতীয় বস্তু লুকাবে, তাই তিনি এ স্বর্ণের তশতরীখানা মাটি চাপা দিয়ে রেখে তথা হতে রওয়ানা হন। কিছুক্ষণ পর পিছনে ফিরে দেখতে পেলেন, মাটি চাপা দেয়া তশতরীখানা উপরে পড়ে আছে। তিনি আবার তা মাটি চাপা দেন। আবার কিছুক্ষণ পর তা মাটির উপরই দেখতে পান। তিনি দুই তিন বার এরূপ করেন, কিন্তু প্রতিবারই তা বেরিয়ে আসে। অবশেষে তিনি তা জমিনের উপর রেখেই সম্মুখে অগ্রসর হন। এবার তিনি দেখলেন, একটি চড়ুই অত্যন্ত অস্থির পেরেশান হয়ে আসছে এবং একটি বাজপক্ষী সেটিকে শিকার করতে দৌড়ে আসছে। যেহেতু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছিল— তৃতীয় বস্তুকে আশ্রয় দেবে। তাই তিনি চড়ুই পাখীটিকে আশ্রয় দিয়ে বাজপক্ষীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এ দেখে বাজপক্ষী বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার উদ্দিষ্ট শিকারকে আশ্রয় দিয়েছেন, অতএব এখন আমার ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করুন। এবার তিনি ভাবলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ— চতুর্থ বস্তুকে নিরাশ করবে না। তাই নিজের উরু থেকে কেটে এক টুকরা দিয়ে দেই। অতএব, তিনি তাই করলেন। এর পর তাঁর দৃষ্টিতে এক মুর্দা পড়ে। আল্লাহর নির্দেশ তোমাবেক তিনি সেটি হতে দূরে পলায়ন করেন।

সন্ধ্যা হলে তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নির্দেশ পালন করেছি। এখন আপনি আমাকে এসবের নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করুন। তিনি নিদ্রা গমন করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অন্তরে প্রক্ষেপ করা হল, হে নবী! তুমি প্রথম যে বস্তু খেলে, তা ক্রোধের উদাহরণ। যেমন তোমার ভক্ষিত পাহাড় প্রথম দেখায় বিশাল ছিল। যখন তুমি তা খেতে সংকল্প করলে তখন তা নিতান্তই ছোট হয়ে তাতে মিষ্ট স্বাদ সৃষ্টি হয়। অনুরূপ প্রথম মানুষের ক্রোধ সৃষ্টি হলে তা নিতান্তই প্রবল হয়, তার উত্তাপ অনেক বেশী থাকে। অতঃপর মানুষ ক্রোধের উপর সহনশীলতাকে প্রবিষ্ট হতে দিয়ে হজম করে ফেললে তা অত্যন্ত উপকারী হয়। এমন লোক জগতময় সহনশীল গম্ভীর বলে পরিকীর্তিত হয়। পরকালে সে এর বিনিময় লাভ করে। অতএব, প্রথম প্রথম ক্রোধ হজম এবং নিজের মাঝে সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি খুবই কষ্টকর মনে হয়, যেমন বিশাল পাহাড় ভক্ষণ প্রথম দিকে তোমার

দৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। মানুষ যখন সহনশীলতা অবলম্বনের দৃঢ় সংকল্প করে তখন সে ক্রোধ মধুর মত গলাধঃকরণ করে ফেলে। যেমন মধুপানে মানুষ মানসিক আনন্দ স্বস্তি পায়, অনুরূপ ক্রোধ হজম করায়ও সে উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করে। কোন কোন কবিও আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রতি নিজ নিজ কবিতায় ইঙ্গিত করেছেন। জনৈক কবি বলেন—

اَلْحِلْمُ اَوَّلاً مُرٌّ مُرَاقِبَةٌ - لٰكِنْ اٰخِرُهٗ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ

—শুরুতে সহনশীলতার স্বাদ তিক্ত এবং প্রবৃত্তির নিকট খুবই কঠিন কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু শেষে তা মধুর চাইতেও উত্তম সুস্বাদু হয়।

সুতরাং সহনশীলতা অবলম্বনকারী এর কল্যাণে ইহ-পরকালীন সম্মান মর্যাদা অর্জন করে।

হে নবী! দ্বিতীয় বস্তু— যা তুমি লুকিয়েছ আর তা বেরিয়ে এসেছে, এ হচ্ছে নিষ্ঠা আন্তরিকতা (এখলাস)-এর সাথে কৃত পুণ্য কর্মের উদাহরণ। যেমন— তোমার দেখা তশতরী বার বার লুকানো সত্ত্বেও বেরিয়ে আসছিল। অনুরূপ মানুষ যখন আন্তরিকতার সাথে কোন এবাদত করে, তাতে প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না, এমনকি সে নিজের এবাদত লুকাতে ছাপাতে সচেষ্ট হয়, যাতে মানুষ জানতে না পারে, তখন সে এবাদত নিজে নিজেই প্রকাশ পেয়ে যায়। যেহেতু এবাদতকারী নিষ্ঠা আন্তরিকতার সাথে এবাদত করেন, তাই আল্লাহ নিজেই এ সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেন। আর হে নবী! তোমার দেখা তৃতীয় বস্তু হচ্ছে আমানতের উদাহরণ! আমানতে খেয়ানত করা অনুচিত; বরং হেফাজত করা কর্তব্য। আর তুমি যে উরুর গোশত কেটে দিয়ে যাজ্ঞাকারী বাজপক্ষীর প্রয়োজন পূরণ করেছ, অনুরূপ যখন কেউ প্রয়োজনে তোমার শরণাপন্ন হবে, তখন তুমি তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবে তাকে নিরাশ করবে না। কেননা, মানুষ সর্বদিক থেকেই বাজপক্ষীর চাইতে বহু বহু গুণ শ্রেয়। হে নবী! পঞ্চম বস্তু— যে থেকে আমি তোমাকে পলায়নের নির্দেশ দিয়েছি— যা মুর্দার আকারে পরিদৃষ্ট হয়েছে, তা হল গীবতের উদাহরণ। অতএব, যেমন মুর্দার থেকে পলায়ন কর, তেমনি গীবত হতেও পলায়ন কর।

বক্ষ্যমাণ ঘটনা ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) তাঁর পিতার সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ভাষণে এরশাদ করেন—

إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيْبُهُ مِنَ الرِّبٰوا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ فِى الْخَطِيْئَةِ مِنْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ زِنَةً يَّزْنِيْهَا الرَّجُلُ وَأَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

—এক টাকা সুদ গ্রহণের গোনাহ ছয়ত্রিশ বার যেনা করার চাইতেও বেশী। আর কোন মুসলমানের ইজ্জত-সম্মান এর চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। —(এহইয়াউল উলূম)

আলোচিত হাদীস থেকে জানা গেল, গীবতের গোনাহ যেনার চাইতেও বহুগুণ বেশী। এক টাকা সুদ গ্রহণের গোনাহ ছয়ত্রিশ বার যেনার চাইতেও বেশী। অতএব, গীবতের গোনাহও ছয়ত্রিশ বার যেনার চাইতে বেশী সাব্যস্ত হল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্তিম উপদেশ

দ্বীন ইসলাম যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হল এবং আল্লাহ তাআলা বিদায় হজ্জে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে ওহী নাযিল করলেন—

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

—আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন—জীবন বিধান মনোনীত করলাম।

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বুঝে ফেললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের সময় সন্নিকটবর্তী। কেননা, কোন বস্তু পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হবার পর তার অবনতির পালা শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা যখন দ্বীনের পূর্ণতা বিধান করেছেন, তাই এখন থেকে অবশ্যই তার ঘাটতি শুরু হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমান থাকতে তা কিভাবে হবে? সুতরাং বুঝা গেল, তাঁর তিরোধানের সময় সন্নিকটবর্তী। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের মৃত্যু রোগ কঠোর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাঁর জীবনের অল্প কিছু দিন মাত্র বাকী, তখন এক বৃহস্পতিবার তিনি নিজের কক্ষ থেকে বের হয়ে মসজিদে শুভাগমন করেন এবং বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, সমগ্র মদীনায় জানিয়ে দাও, আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এসেছেন এবং কিছু উপদেশ প্রদান করবেন। যার শুনতে ইচ্ছা হয় সে যেন আসে। কেননা, এটাই তাঁর অন্তিম উপদেশ। তাঁর তিরোধানকাল সন্নিকটবর্তী। হযরত বেলাল (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক সমগ্র মদীনায় তাঁর মসজিদে শুভাগমনের খবর ঘোষণা করে দেন। এ ঘোষণা শুনতেই রাসূল প্রেমিকগণ মসজিদে নববীতে সমবেত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করেন এবং উম্মতের সাথে বিচ্ছিন্নতার কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করেন। এর পর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা স্তুতি করেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন। এর পর উম্মতের উদ্দেশে হিতোপদেশ দান আরম্ভ করেন।

শুরুতেই তিনি সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোকসকল! এটাই আমার অন্তিম উপদেশ। আমি তোমাদেরকে নামায নষ্ট না করার, নামাযে কোন প্রকার ত্রুটি অবহেলা না করার এবং দাসদাসী চাকর বাকরকে কষ্ট না দেবার অন্তিম উপদেশ করছি। এভাবে তিনি সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। তিনি এও বলেন—

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এক বিশাল ময়দানে একত্র করবেন। সে দিনটি হবে অত্যন্ত ভীতিকর— ভয়ংকর। সেদিন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না, শুধু সে ব্যক্তিরই উপকার হবে যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হবে। তোমরা রসনার সুসংরক্ষণ করবে, সর্বদা অশ্রু বহাবে। হে লোকসকল! তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে না। কেননা, এমন লোকদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে এবং সকলকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—রেফক অধ্যায়)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— مَنْ سَتَرَ عَلٰى مُؤْمِنٍ عَوْرَتَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

—যে কোন মোমেনের দোষ গোপন করবে, তার গীবত করবে না, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষ লুকাবেন।

দুনিয়ায় যে মানুষের দোষক্রুটি প্রকাশ করবে, গীবত করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করবেন এবং জাহান্নামে পাঠাবেন। —(এহইয়াউল উলুম—সেফাতিল মাসায়েল অধ্যায়)

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَتَهْلِكُوْا — তোমরা একে অন্যের গীবত করো না, তা হলে ধ্বংসে পতিত হবে।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নসীহত অধ্যায়)

আরেক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ عَنْ اَعْرَاضِ النَّاسِ اَقَالَ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ —যে মানুষের সম্মান বিনষ্ট করা হতে নিজের রসনা প্রতিরুদ্ধ করে রাখবে, মানুষের গীবত করবে না, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং তাকে দয়া প্রদর্শন করবেন।

কারণ, সে একজন মুসলমানের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছে। তার মান-সম্মানের পিছনে লাগেনি। —(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস)

ফোযায়ল বিন ইয়ায (রঃ)-এর উপদেশ

জনৈক ব্যক্তি হযরত ফোযায়ল বিন ইয়ায (রঃ)-কে বললেন, কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন—

احفظ عَنِّىْ خَمْسًا اَوَّلُهَا مَا اَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقُلْ ذٰلِكَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى تَرْفَعُ الْمَلَامَةَ عَنِ الْخَلْقِ وَثَانِيُهَا اِحْفَظْ لِسَانَكَ وَاَنْتَ تَنْجُوْا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَثَالِثُهَا صَدِّقْ رَبَّكَ بِمَا وَعَدَكَ مِنَ الرِّزْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مُؤْمِنًا وَرَابِعُهَا اِسْتَعِدَّ الْمَوْتَ حَتّٰى لَا تَمُوْتَ غَافِلًا وَخَامِسُهَا اُذْكُرِ اللّٰهَ كَثِيْرًا حَيْثُ مَا كُنْتَ تَكُوْنُ مُحْصِنًا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ ـ

— হে প্রশ্নকর্তা! আমি তোমাকে পাঁচটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি। প্রথম— দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী যে মসিবতই হোক, তাকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্যের সাথে মিলিয়ে নেবে। মনে করবে, যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা তাকদীরে ছিল। তা হলে মানুষের উপর থেকে অভিযোগ দূরীভূত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়— নিজের রসনা সংযত রাখ— কারো গীবত করো না, তা হলে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পাবে।

তৃতীয়— রেযেক সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস কর, তা হলে তুমি মোমেন হবে।

চতুর্থ— সদা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক। তা হলে উদাসীন অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে না।

পঞ্চম— যেখানেই থাক, বেশী বেশী আল্লাহ তাআলার যেকের কর। এ যেকের গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার সুরক্ষিত দুর্গ হবে।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—যেকরুল্লাহ অধ্যায়)

সাহাবায়ে কেরামের রীতি

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ গাযালী (রঃ) বলেন—

كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَلَاقَوْنَ بِالْبِشْرِ وَلَا يَغْتَابُوْنَ عِنْدَ الْغِيْبَةِ وَيَرَوْنَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ

— সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি ছিল, তাঁরা কারো সাথে মিলিত হতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হতেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করতেন না। এমন করতেন না যে, কারো সম্মুখে প্রশংসা এবং পেছনে দুর্নাম করবেন। এটা তাঁরা উত্তম আমল মনে করতেন।

যারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি অনুসরণ করে চলবে তারা জান্নাতে। আর যারা তাঁদের রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার দুর্গন্ধময় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। তিনি এরশাদ করলেন, এ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণ, মোনাফেকরা কোন মুসলমানের গীবত করেছে।

—(খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে বর্তমানকালেও গীবতের কারণে নানা প্রকার কষ্ট মসিবত আপতিত হয়। সর্বপ্রকারের কঠোরতা সংকীর্ণতা আত্মপ্রকাশ করে। অথচ মানুষ এর প্রতি উদাসীন। গীবতের কুফলস্বরূপ নানা প্রকার কষ্ট মসিবত, কঠোরতা সংকীর্ণতা দেখেও তওবা করে না।

জনৈক ব্যক্তি চিঠিতে কয়েকজনের গীবত লেখে মানুষের কাছে পাঠায়। এ কাজ আল্লাহ তাআলার নিতান্তই অপছন্দ হয়। তার থেকে এক ভুল কর্ম প্রকাশ পায়। ঘটনাক্রমে একদিন সে এবং তার এক ছাত্রের মাঝে ঝগড়ার ঘটনা ঘটে। ছাত্রপ্রবর তাকে যথেষ্ট দাপটায়। এ নিয়ে রক্তপাত ঘটে। আর এ ঘটনা বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত লোকটি খুবই লজ্জিত অনুতপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও তার মনে হল না, এটা গীবত এবং দুর্নাম রটনারই প্রতিফল।

গীবতের কারণে বালা মসিবত নাযিল হয়

জনৈক ব্যক্তি নিজের প্রিয়জন আত্মীয় স্বজনের গীবত করে বেড়াত। এ গর্হিত কর্মেই নিজের মহামূল্যবান সময় ব্যয় করত। আল্লাহ তাআলা তার উপর পরমুখাপেক্ষিতার বিপদ চাপিয়ে দেন, তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। নিজের নিঃস্বতা অসচ্ছলতার কারণে সে খুবই পেরেশান হয়। এমনকি প্রয়োজন পূরণে তার মানুষের নিকট ভিক্ষা করতে হয় এবং কঠিন কষ্টে নিপতিত হয়।

এক মেয়েলোক মানুষের খুব বেশী গীবত করে ফিরত। গীবত করে করে নিজের আত্মীয় স্বজনকে কষ্ট দিত। আল্লাহ তাআলা তার পেটে জখম করে দেন। যে কারণে তার শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হতে থাকে। অবশেষে এ রোগেই সে মৃত্যু বরণ করে।

আরেক লোক ওস্তাদের নাফরমানী করত এবং তাঁর গীবত দুর্নাম করে সময় কাটাত। ঘটনাক্রমে খোলা মজলিসে ওস্তাদের সাথে তার লড়াই হয়। ওস্তাদ মজলিসেই তাকে জুতা মেরে বসেন। মানুষ তাকে মন্দ বলতে শুরু করে। এভাবেই সে গীবতের শাস্তি ভোগ করে।

বর্তমানকালের লোকদের প্রতি হিতোপদেশ

একদিন খালেদ রেবয়ী জামে মসজিদে বসা ছিলেন। লোকজন কারো গীবত কারো দুর্নাম বর্ণনা করতে শুরু করে। তিনি তাদেরকে গীবত দুর্নাম

করতে নিষেধ করেন। কিছুক্ষণ পরই তারা আবার গীবত শুরু করে। এ সময় শয়তানের প্রতারণায় খালেদও তাতে শরীক হন। সে দিন রাতে ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখেন, এক লোক শূকরের গোশত এনে তাকে বলছে— খাও। খালেদ স্বপ্নেই জবাব দিলেন, এ তো অপবিত্র— হারাম। আমি তা কি করে খাব? স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তি বলল, তুমি গীবত করে এর চাইতেও খারাপ বস্তু ভক্ষণ করেছ— যার গীবত করেছ তার গোশত খেয়েছ। এর পরে সে লোক জোরপূর্বক খালেদ রেবয়ীর মুখে শূকরের গোশত পুরে দেয়। খালেদ বলেন, জাগার পর হতে ত্রিশ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। —(তাম্বীহুল গাফেলীন)

অতএব, ভাই সকল! যদি শূকরের গোশত ভক্ষণ কাম্য হয়, তবেই অন্যের গীবত দুর্নাম কর, নতুবা এ থেকে বিরত হও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেরাজে গমন করেন, তখন তিনি দেখতে পান, কিছু মানুষ মৃতের গোশত খাচ্ছে। তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তিনি জবাব দিলেন, এরা সেসব লোক যারা দুনিয়ায় মানুষের গীবত করত। —(সীরাতে আহমদিয়া)

যে স্বপ্নে মৃতের গোশত খেতে দেখে, সে মানুষের গীবত করবে।
—(এহইয়াউল উলূম— হুকুকুস সোহবত)

কেউ স্বপ্নে মানুষের গোশত খাচ্ছে দেখলে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, সে মানুষের গীবত করবে। কেননা, কোরআন করীমে গীবতের উপমা মানুষের গোশত ভক্ষণের সাথে দেয়া হয়েছে। —(তাবীরুর রুইয়া লিইবনে সিরীন)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهٖ ظَنَّ السُّوْءِ۔

—আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মোমেনের উপর অন্য মোমেনের রক্ত, সম্পদ, সম্মান এবং তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ হারাম করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, বিনা কারণে কাউকে হত্যা করলে হন্তা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যদিও সে তওবা করে মৃত্যুবরণ করে। আর কারো মাল-সম্পদ চুরি করা, ছিনিয়ে নেয়া, সম্মানহানি করা হারাম।

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম

হযরত ওহায়ব মক্কী (রঃ) বলেন—

لَاَنْ اَدَعَ الْغِيْبَةَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَاَنْ اَغُضَّ بَصَرِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ الدُّنْيَا لِيْ وَمَا فِيْهَا

— আমার নিকট গীবত পরিহার এবং দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম। —(তাম্বীহুল গাফেলীন)

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম হওয়ার কারণ, দুনিয়া অস্থায়ী ধ্বংসশীল, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। আর আখেরাতে দুনিয়ার কোন বস্তু মিলবে না; বরং দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর কারণে মানুষ আখেরাতে শুধু দুঃখ অনুতাপ অনুশোচনাই লাভ করবে। পক্ষান্তরে গীবত পরিহারের সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে। আর আখেরাতে যে সওয়াব লাভ করবে সেই আনন্দিত উৎফুল্ল হবে। তাই হযরত ওহায়ব (রঃ) গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া হতে উত্তম বলেছেন।

অন্যের গোপন বিষয় ফাস করার অনিষ্ট

কারো দোষ এবং গোপন বিষয় ফাস করার প্রথম অনিষ্ট হল, যার দোষ এবং গোপন বিষয় ফাস করা হয়, ফাসকারী তার নিকট তুচ্ছ অসম্মানী হয়ে যায়। অথচ বর্তমানকালে এ বিষয়টা অনেক বেশী ব্যাপক হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই অন্যের গোপন বিষয় ফাস করে দেয়। একজনকে অন্য জনের গোপন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি বলেও দেয়, এ কথা কারো কাছে বলবেন না—তবু সে কথা অন্যকে বলে দেয়।

উপদেশবাণী

কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব বলেন—

اِنْ ضَعُفْتَ عَنْ ثَلٰثٍ فَعَلَيْكَ بِثَلٰثٍ اِنْ ضَعُفْتَ عَنِ الْخَيْرِ فَاَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ وَاِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَنْفَعَ النَّاسَ فَاَمْسِكْ عَنْهُمْ وَاِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ فَلَا تَاْكُلْ لُحُوْمَ النَّاسِ -

—যদি তুমি তিনটি বিষয়ে অক্ষম হও তবে তিনটি বিষয় মেনে চলা অত্যাবশ্যক। যদি তুমি ভাল না করতে পার তবে মন্দ হতে বিরত থাক।

যদি মানুষের উপকারে অক্ষম হও, তবে তাদের ক্ষতি হতে বিরত থাক। যদি রোযা রাখতে অসমর্থ হও, তা হলে মানুষের গোশত খেয়ো না— গীবত করো না। —(তাম্বীহুল গাফেলীন)

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন—

لَا تَذْكُرْ اَخَاكَ فِىْ غَيْبَتِهٖ اِلَّا كَمَا تُحِبُّ اَنْ يَذْكُرَ فِىْ غَيْبَتِكَ

— তোমার ভাইয়ের আলোচনা তার অনুপস্থিতিতে সেভাবেই কর, নিজের অনুপস্থিতিতে তুমি তোমার যেরূপ আলোচনা পছন্দ কর। তোমার অনুপস্থিতিতে কেউ তোমার গীবত করলে তুমি যেমন তা খারাপ জান, সেরূপ অন্যের অনুপস্থিতিতে নিজে তার গীবত করাও খারাপ জান। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) অন্যত্র বলেন—

اِنَّ لِابْنِ اٰدَمَ جُلَسَاءُ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ فَاِذَا ذَكَرَ اَحَدُهُمْ اَخَاهُ بِخَيْرٍ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ وَلَكَ مِثْلُهُ وَاِذَا ذَكَرَ اَحَدُهُمْ اَخَاهُ بِسُوْءٍ قَالَتْ يَابْنَ اٰدَمَ كَشَفَ الْمَسْتُوْرَ عَلَيْهِ عَوْرَتَهُ اِرْجِعْ اِلٰى نَفْسِكَ وَاحْمَدِ اللّٰهَ الَّذِىْ سَتَرَ عَلَيْكَ ـ

—প্রত্যেক আদম সন্তানেরই ফেরেশতা সঙ্গী রয়েছে। অতএব, আদম সন্তান যখন অন্যের সম্পর্কে ভাল আলোচনা করে, তখন তার সঙ্গী ফেরেশতা বলে, ওহে! তুমিও তার মতই, যার সম্পর্কে ভাল আলোচনা করলে। আর যদি কেউ অন্যের সম্পর্কে খারাপ আলোচনা করে, তা হলে তার সঙ্গী ফেরেশতা বলে, হে আদম সন্তান! তুমি তার গোপন বিষয় প্রকাশ করলে। তুমি নিজের প্রতি তাকাও (তোমার মাঝেও অনেক দোষ-ত্রুটি মন্দ বিষয় রয়েছে) এবং আল্লাহর প্রশংসা কর। কেননা, তিনি তোমার দোষ গোপন রেখেছেন। — (তাম্বীহুল গাফেলীন)

গীবত করা এবং দোষ প্রকাশ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারো দোষ বর্ণনা করাকে গীবত বলে। আর এ গীবত বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অপদস্থ করা। বর্ণনাকৃত এ দোষ মানুষ আগে থেকে জানুক বা নাই জানুক; বরং তার বর্ণনা করার পরই মানুষ এ সম্পর্কে অবহিত হোক—

এটা গীবত। আর দোষ প্রকাশের আগে থেকে মানুষ তা অবহিত না থাকা আবশ্যক। মানুষকে অবহিত করার জন্যই সে দোষ বর্ণনা করেছে। যেমন— কেউ বেনামাযী– এ বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধ। এখন কেউ যদি তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অপমান অপদস্থ করার জন্য তার বেনামাযী হওয়ার কথা বর্ণনা করে, তা হলে এটা গীবত হবে। এটা তার দোষ প্রকাশ করা বলা যাবে না। কেননা,তার বেনামাযী হওয়া আগে থেকেই জনসমাজে প্রসিদ্ধ।

গীবত না করা সচ্চরিত্র

সাহাবী হযরত সোলায়মান বিন জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু হিতোপদেশ দান করুন। তিনি এরশাদ করলেন— اِنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ وَاِنْ اَدْبَرَ فَلَا تَغْتَابُهُ — যদি কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত কর তবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত কর। পশ্চাতে তার গীবত করো না— দোষ বর্ণনা করো না।

— (এহইয়াউল উলূম)

কারো সাক্ষাতে তাকে খুশী রাখা এবং অনুপস্থিতিতে তার গীবত না করাই সচ্চরিত্র। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন— اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ — নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম চরিত্রের উপর রয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লিখিত রূপ প্রশংসা করার কারণ, তিনি সবার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করতেন, যদিও সে কাফের হোক এবং পশ্চাতে তার গীবত করতেন না। বরং কারো দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার দোষ বর্ণনা করতেন। কিন্তু এমন লোকও সাক্ষাতে আসলে তিনি অত্যন্ত সদ্ভাবে তার সাথে সাক্ষাত করতেন।

বর্তমানকালের লোকদের প্রতি উপদেশ

চিন্তার বিষয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরের সাথেও হাসিমুখে সাক্ষাত করতেন, কারো পশ্চাৎনিন্দা করতেন না। এ ছিল তাঁর উত্তম চরিত্রের মাহাত্ম্য। আর বর্তমানকালের লোকেরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বলে দাবী করে, অথচ

তাঁর আদর্শের বিপরীত কাজ করে। কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা কারো সাক্ষাতে তার প্রতি ঈর্ষা-ক্রোধবশতঃ ক্রুদ্ধ থাকে, তার সাথে ভালভাবে কথাও বলে না, আর তার পশ্চাতে গীবত করা নিজের আহার্য করে নেয়। রাত দিন তার নিন্দাবাদেই ব্যস্ত থাকে। আবার কিছু লোক আছে, কারো সাক্ষাতে তাকে যথেষ্ট সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করে, তার সাথে সানন্দ চিত্তে হাসি খুশীর কথা বলে। কিন্তু মজলিস শেষ হলেই কোন শরীঅতসম্মত কারণ ব্যতিরেকে তার গীবত করতে শুরু করে। তার গোপন দোষসমূহ প্রকাশ করে বেড়ায়। আবার এরাই নিজেদেরকে সচ্চরিত্র গুণে গুণান্বিত বলে দাবী করে। অথচ তারা যে ভাবসাব প্রদর্শন করে তা নিতান্তই লোক দেখানো আচরণ। এরা যদিও প্রথমোক্ত লোকদের তুলনায় কিছুটা ভাল, কিন্তু মূলতঃ এরাও মন্দ লোকই বটে। এদের জন্য দুঃখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত দাবীদার হয়েও তাঁর আদর্শ এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ পরিত্যাগ করে চলেছে। এদের উচিত তওবা করে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত হওয়া। নিম্নে এতদবিষয়ক কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মোআয (রাঃ)-এর উদ্দেশে এরশাদ করেন—

يَا مُعَاذُ اِقْطَعْ لِسَانَكَ عَنْ اِخْوَانِكَ وَلٰكِنْ ذُنُوْبَكَ عَلَيْكَ وَلَا تَحْمِلْهَا عَلٰى اِخْوَانِكَ وَلَا تُزَكِّ نَفْسَكَ بِتَذْمِيْمِ اِخْوَانِكَ وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ بِوَضْعِ اِخْوَانِكَ وَلَا تُرَائِ بِعَمَلِكَ وَالنَّاسَ -

— হে মোআয! তোমার রসনা তোমার ভাইদের তরফ থেকে প্রতিরুদ্ধ করে রাখ— তাদের গীবত করো না, তা হলে এর গোনাহ তোমার উপরই চাপবে। তোমার ভাইদের দোষ প্রকাশ করো না, ভাইদের নিন্দাবাদ দুর্নাম করে নিজেকে ভাল প্রতিপন্ন করো না, তোমার ভাইদেরকে হেয় অপমান করে নিজেকে উচ্চ করো না এবং এবাদতে রিয়া — লোকদেখানো মনোভাব গ্রহণ করো না। — (তাম্বীহুল গাফেলীন—তাফাক্কুর অধ্যায়)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

لَا يَرَى الْمُؤْمِنُ مِنْ اَخِيْهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرُهَا عَلَيْهِ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

— যে কারো দোষ দেখে তা গোপন করে, নিঃসন্দেহে সে জান্নাতের যোগ্য হবে। —(এহইয়াউল উলূম—হুকুকুল মোসলেম অধ্যায়)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبٰوا الْاِسْتِطَالَةَ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

—না হক কোন মুসলমানের সম্মানহানি করা সুদের চাইতেও বড় গোনাহ।

—(বায়হাকী)

নাহক মুসলমানের সম্মানহানি করা সুদের চাইতেও বড় গোনাহ হওয়ার কারণ, সুদে তো শুধু গৃহীত ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। পক্ষান্তরে গীবত দ্বারা একজন মানুষের সম্মান হরণ করা হয়। অথচ একজন মুসলমানের সম্মান সর্ববস্তুর চাইতে উত্তম সম্মানার্হ। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদামতে মানুষ ফেরেশতার চাইতে উত্তম।

উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেগায়রে হাক্কিন– নাহক কারো সম্মান বিনষ্টির কথা বলে ইঙ্গিত করেছেন, গীবত যদি হক হয় তবে তা বৈধ। তা ইহজাগতিক হোক আর পরকালীনই হোক। এ কারণেই জালেম অত্যাচারীর গীবত বৈধ। অনুরূপ কেউ মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা বৈধ। যেমন— হাদীসবেত্তাগণ বর্ণনাকারীদের সমালোচনা পর্যালোচনা করে কোন কোন বর্ণনাকারীকে তুচ্ছ হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। কেননা, সর্বসাধারণ মানুষ যদি এসব মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অবহিত না হয়, তা হলে তারা এদের বর্ণনাকৃত হাদীসকে সত্য জ্ঞান করবে। এতে করে দ্বীনী বিষয়সমূহে এক মহা সংকটের সৃষ্টি হবে এবং ইসলামে বিভ্রান্তি প্রবিষ্ট হবে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— اَلْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ تَحْتَطَّانِ الْاِيْمَانَ — গীবত ও চোগলখোরী ঈমান ছিলে দেয়– ঈমানের উপরের আবরণ খসিয়ে দেয়। কোন মানুষ গীবত করলে এ কারণে তার ঈমানের কিছু অংশ ছিলে যায়। এমনকি গীবত করতে করতে অবশেষে মৃত্যুকালে তার ঈমান একেবারেই চলে যায়। আর চোগলখোরীর অবস্থাও এরূপই। —(সীরাতে আহমদিয়া)

গীবত ও চোগলখোরীর মধ্যে পার্থক্য

দুই ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া মনোবাদ সৃষ্টির উদ্দেশে একজনের কথা অন্য জনের নিকট বর্ণনা করা হচ্ছে চোগলখোরী। যেমন— কাউকে এরূপ বলা— অমুক তোমাকে মন্দ বলে, তোমার নিন্দাবাদ করে। আর গীবত হচ্ছে, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা, এক্ষেত্রে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নাই বা থাকুক। অতএব, যেখানে চোগলখোরী থাকবে সেখানে গীবতও থাকবে। —(শরহে মুসলিম লিইমাম নববী)

কারো কারো মতে, গীবত ও চোগলখোরীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যা গীবত তাই চোগলখোরী এবং যা চোগলখোরী তাই গীবত। কারো কারো মতে অন্যের দোষ প্রকাশ করা, গোপন বিষয় ফাস করাকে চোগলখোরী বলে। সেক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি উদ্দেশ্য হোক বা নাই হোক।

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) এহইয়াউল উলূম গ্রন্থে দ্বিতীয়োক্ত মতই সমর্থন করেছেন। কিন্তু এতদবিষয়ক হাদীসসমূহে গভীর চিন্তা ভাবনা করলে প্রথম মতই সত্য বলে মনে হয়।

এবাদতের চাইতে গীবত পরিহার উত্তম

তাবেয়ীগণের কেউ কেউ বলেন— আমরা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর অবস্থা দেখেছি, তাঁরা নামায রোযাকে তেমন এবাদত মনে করতেন না, যেমন গীবত করাকে এবাদত মনে করতেন। —(এহইয়াউল উলূম)

আমার (গ্রন্থকার) মতে, যদিও নামায সবচেয়ে উত্তম এবাদত এবং কেউ কেউ রোযাকে উৎকৃষ্টতর এবাদতের মধ্যে গণ্য করেছেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম গীবত থেকে বেঁচে থাকা নামায রোযার চাইতেও উত্তম এবাদত মনে করতেন। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ ঃ নামায রোযা আল্লাহ তাআলার এমন এবাদত, যেগুলো পরিত্যাগ করলে শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করা হবে, শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু এর সাথে বান্দার অধিকার সংযুক্ত নয়। বিপরীতপক্ষে গীবতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী অবাধ্যতা ছাড়া বান্দার অধিকারও সংযুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা দয়ালু, ক্ষমাশীল, তওবা দ্বারা তাঁর নাফরমানী অবাধ্যতার গোনাহ মাফ হতে পারে। কেননা, তিনি বান্দার উপর রহমতের দৃষ্টি রাখেন, এমনকি কাফেরকেও রেযেক প্রদান

করেন। তাই গোনাহগার বান্দা আল্লাহর রহমতের দরবারে হাত উঠিয়ে কান্নাকাটি করে গোনাহ মাফ চাইলে নিঃসন্দেহে তিনি মাফ করে দেবেন। গোনাহগার নিজের গোনাহের জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করবেন। কেননা, চাকর অবাধ্যতা করার পর যদি হাত জোড় করে মনিবের সামনে দাঁড়ায়, তা হলে মনিব চাকরের অপরাধ অবাধ্যতা মাফ করে দেন। বিপরীতপক্ষে গীবতকারী শুধু তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেই দায়িত্বমুক্ত হবে না, যতক্ষণ না যার গীবত করেছে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে অপরাধ ক্ষমা না করাবে। সুতরাং, নামায, রোযা পরিত্যাগের চাইতেও গীবত নিকৃষ্টতর গোনাহ। আর গীবত পরিহার নামায রোযার চাইতে উত্তম।

দ্বিতীয় কারণ ঃ এবাদতের চাইতে গোনাহ পরিহার উত্তম। তাই কেউ এবাদত করে না বটে, তবে শরীঅত নিষিদ্ধ গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, সে এমন ব্যক্তি থেকে উত্তম যে সদা সর্বদা এবাদত করে এবং সাথে সাথে সর্বপ্রকার সগীরা কবীরা গোনাহেও লিপ্ত হয়। বিশেষতঃ যেসব গোনাহ গীবতের মত নিকৃষ্টতর। সুতরাং এ মূলনীতি যখন প্রত্যেক গোনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তখন গীবতের ক্ষেত্রে আরও উত্তমরূপে প্রযোজ্য হবে। অতএব, অত্র মূলনীতির আলোকে গীবত হতে আত্মরক্ষা নামায রোযা হতে উত্তম হবে। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গীবত হতে আত্মরক্ষা এবাদতের চাইতে উত্তম মনে করতেন।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—কে প্রশ্ন করল, যে এবাদত বেশী করে এবং গোনাহও বেশী করে, সে উত্তম নাকি যে এবাদত কম করে কিন্তু গোনাহও কম করে সে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জবাব দিলেন— مَا اَعْدَلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا — যে এবাদত কম করে এবং গোনাহও কম করে, সে-ই উত্তম এবং সে নিরাপদও বটে। কেননা, এবাদতের চাইতে গোনাহ পরিহারে সওয়াব বেশী।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন— যুনূব অধ্যায়)

তৃতীয় কারণ ঃ প্রতিটি গোনাহই রোগস্বরূপ। আর যে রোগের ওষুধ অজ্ঞাত এবং তা ভালভাবে চিহ্নিতও করা যায় না, সে রোগ হতে আত্মরক্ষা খুবই দুষ্কর, তা হতে সুস্থতা লাভেও সন্দেহ রয়েছে। তেমনি

গীবতও একটি মানসিক রোগ। এ রোগের চিকিৎসা সর্বসাধারণ মানুষের দ্বারা হয়ে উঠে না। কেননা, এর অনিষ্ট কারো ধারণায়ই ভালভাবে আসে না। পক্ষান্তরে নামায রোযা ত্যাগের অনিষ্ট সম্পর্কে সবাই ভালভাবে অবহিত।

চতুর্থ কারণ ঃ যে রোগের চিকিৎসক নেই তা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পেয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। এমনকি এ রোগ এক সময় রোগীর জীবনই নিয়ে নেয়। গীবতও এমনই রোগ, যার কোন চিকিৎসক নেই। কেননা, গোনাহরূপী রোগের চিকিৎসক হলেন ওলামায়ে কেরাম। আর তাঁরাই গীবত রোগে আক্রান্ত হয়ে আছেন। তাঁরাই যেখানে গীবত রোগগ্রস্ত, সেখানে অন্যদেরকে সুস্থ করবেন কিভাবে? পক্ষান্তরে নামায রোযা ত্যাগ করা ওলামায়ে কেরাম খারাপ মনে করেন। মানুষকে এর মন্দ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেন। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গীবত থেকে আত্মরক্ষা উত্তম মনে করতেন।

পঞ্চম কারণ ঃ যে রোগের প্রভাব প্রতিক্রিয়া সংক্রামক, যা দ্বারা রোগী ব্যতীত অন্যেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা মানুষের নিকট খুবই খারাপ রোগ। যেমন— চুলকানি রোগকে সবাই খারাপ জানে। কেননা, কখনও কখনও এ রোগ রোগীকে ছাড়িয়ে অন্যের মাঝেও সংক্রমিত হয়। আর গীবত এমনই এক রোগ, যা দ্বারা গীবতকারীর সাথে সাথে গীবতকৃত ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে নামায রোযা পরিত্যাগজনিত গোনাহের বিপদ স্বয়ং গোনাহগারের মধ্যেই সীমিত থাকে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নামায রোযা পরিত্যাগের চাইতে গীবতকে নিকৃষ্টতর মনে করতেন।

ষষ্ঠ কারণ ঃ নামায রোযা পরিত্যাগ হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গোনাহ। আর গীবত হল রসনার গোনাহ এবং রসনার গোনাহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গোনাহের চাইতে অনিষ্টকর। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গীবতকে নামায রোযা পরিহারের চাইতে অনিষ্টকর মনে করতেন।

নিম্নে গীবতের অনিষ্ট সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

হাদীস ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ —আল্লাহ তাআলা যাকে দুইটি বস্তুর অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন, সে জান্নাতের যোগ্য হবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে বস্তুদ্বয় কি? তিনি এরশাদ করেন— مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا رِجْلَيْهِ —এক হচ্ছে— যা উভয় চোয়ালের মধ্যখানে রয়েছে। অর্থাৎ রসনা। দ্বিতীয় হচ্ছে— যা উভয় পায়ের মধ্যখানে। অর্থাৎ লজ্জাস্থান।

যে এ বস্তুদ্বয়ের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছে, সে জান্নাতের আর যে এর অনিষ্ট কবলিত, সে জাহান্নামের যোগ্য। —(মোআত্তায়ে ইমাম মালেক)

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَأَنَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا ـ

—ভোর হলে মানুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রসনার সাথে বিদ্রোহ করে— বলে, ওহে! তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আমরা তোমার সঙ্গে রয়েছি। আমাদের ভাল মন্দ তোমার ভাল মন্দের উপর নির্ভরশীল। তুমি সোজা থাকলে আমরাও সোজা, আর তুমি বক্র হলে আমরাও বক্র হব। — (তিরমিযী)

হাদীস ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কোন্ বস্তুর কারণে মানুষ জাহান্নামে যায়। তিনি এরশাদ করলেন اَلْأَجْوَفَانِ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ —মধ্যখানের দুই বস্তু— মুখ এবং লজ্জাস্থান। এ দুইয়ের গোনাহের কারণেই অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে।

—(ইবনে মাজা— যুনূব অধ্যায়)

এ হাদীস থেকে জানা গেল, দুই বস্তু মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে— মুখ এবং লজ্জাস্থান। কিন্তু মুখের গোনাহ লজ্জাস্থানের গোনাহের চাইতে নিকৃষ্টতর। কেননা লজ্জাস্থানের গোনাহের অধিকাংশ বিপদ শুধু গোনাহকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর মুখের গোনাহ অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট।

উপদেশ ঃ বর্তমানকালে মানুষের মোত্তাকী হওয়া না হওয়া প্রকাশ্য এবাদত যেমন নামায রোযা ইত্যাদির উপর ভিত্তিশীল হয়ে পড়েছে। যে

বেশী বেশী নামায পড়ে, রোযা রাখে, দোআ করে, বেশী বেশী সদকা দেয়, মানুষ তাকে অনেক বড় আবেদ— এবাদতকারী এবং দুনিয়াবিরাগী বলে। যদিও সে সারা দিন মানুষের গীবত করে এবং দুর্নাম রটিয়ে রটিয়ে সময় অতিবাহিত করুক। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য এবাদত কম করে, কিন্তু অন্যের গীবত করে না, দুর্নাম রটায় না, এ থেকে সযতনে বেঁচে থাকে, তাকে মানুষ মোত্তাকী বলে না। এর কারণ— মানুষের দৃষ্টিতে গীবত হারাম কিছু নয়। তাদের নিকট গীবত করা না করা কোন প্রকার গুরুত্ব বহন করে না।

গীবত যেনার চাইতেও নিকৃষ্টতর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنْ ثَلٰثِيْنَ زَنْيَةً فِى الْاِسْلَامِ —গীবত ইসলাম অবস্থায় ত্রিশ বার যেনার চাইতেও নিকৃষ্টতর। —(আইনুল এলেম)

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে ইসলাম অবস্থায় যেনা করা কুফরের অবস্থায় গোনাহ করার চেয়ে বেশী অনিষ্টকর। এর দুই কারণ—

প্রথম কারণ ঃ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে কাফেরের প্রতি ঈমান গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। কারো কারো মতে শাখা মাসআলা, যেমন— নামায রোযার ওয়াজিব হওয়া এবং সুদ ও যেনা হারাম হওয়ার বিধান কাফেরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যারা এ মতের প্রবক্তা, তারা বলেন, কেয়ামতে কোন মুসলমানের উপর আযাব হলে তা গোনাহের কারণেই হবে। আর কাফেরের শাস্তি হবে শুধু তার কুফরের কারণে। নামায রোযা পরিত্যাগ অথবা যেনার কারণে কোন কাফেরের শাস্তি হবে না। কেননা, এসব বিধান কারো জন্য প্রযোজ্য হওয়ার শর্ত হল ঈমান। সুতরাং কাফেরের যখন ঈমানই নেই, তখন বিধানও তার উপর ওয়াজিব হবে না। এ আলোচনা থেকে জানা গেল, কুফরের অবস্থায় যেনার তুলনায় ঈমানের অবস্থায় যেনা করা খুবই মন্দ, অনিষ্টকর। কেননা, যেনার কারণে কাফেরের আযাব হবে না। যদিও ঈমান গ্রহণ না করার কারণে আযাব ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে যেনার কারণে অতি অবশ্যই এ জন্য মুসলমানকে আযাব ভোগ করতে হবে এবং তা হবে খুবই কঠিন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ কুফরী অবস্থায় কৃত যেনার গোনাহ মাফ হওয়া তওবার উপর নির্ভরশীল নয়; আর তা হতে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য অনুতাপ

অনুশোচনাও ওয়াজিব নয়; বরং কাফের যখন কুফরী হতে ফিরে আসবে এবং নিজের অন্তরে ঈমান দৃঢ় স্থিত করবে, তখন কুফরী অবস্থায় কৃত তার যাবতীয় গোনাহ আপনা আপনি মাফ হয়ে যাবে। তা যেনা হোক আর অন্য কোন গোনাহই হোক। যদিও ঈমান গ্রহণকালে যেনার কারণে তার অন্তরে কোন অনুতাপ অনুশোচনাবোধ নাই থাকুক। কেননা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে, ঈমান পূর্বেকার সব গোনাহ নিঃশেষ করে দেয়, পক্ষান্তরে মুসলমানের যেনার গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না, তার ব্যক্তিসত্তা পবিত্র হয় না। আর কোন পুণ্য কর্মের কারণেও যেনার আযাব তিরোহিত হয় না। যদিও তা সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, কিন্তু কবীরা গোনাহ মাফ হয় না, যতক্ষণ না তওবা করা হবে।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল, মুসলমানের যেনা কাফেরের যেনার চাইতে অনিষ্টকর। তাই কাফেরের সব গোনাহ একটি পুণ্য কর্ম দ্বারাই মাফ হয়ে যায়, যা সকল পুণ্য কর্মের চাইতে উত্তম, আর তা হচ্ছে ঈমান। পক্ষান্তরে মুসলমানের যেনার গোনাহ তওবা ব্যতিরেকে অন্য কোন পুণ্য কর্মেই মাফ হয় না। হাঁ, মহান আল্লাহর রহমত হলে তিনি বিনা তওবায়ও বান্দার গোনাহ মাফ করে দেবেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فِى الْإِسْلَامِ অর্থাৎ, ইসলাম অবস্থায় শব্দটি বাড়িয়েছেন। যাতে হৃদয়ঙ্গম হয়, ইসলাম অবস্থায় কৃত যেনা সে যেনার চাইতে ত্রিশ গুণ বেশী নিকৃষ্টতর, যা একজন কাফের থেকে প্রকাশ পায়।

উপদেশ

বর্তমানকালে যেনাকে গীবতের চাইতে বড় গোনাহ বলে মনে করা হয়। তাই কোন সম্মানিত সদ্বংশজাত বা আলেম ব্যক্তি দ্বারা যেনা সংঘটিত হলে সর্বশ্রেণীর লোক এটাকে অত্যন্ত দূষণীয় ভাবে এবং সংশ্লিষ্ট জনকে নানাভাবে দুর্নামগ্রস্ত করে। শহরময় দেশময় তাকে পাপাচারী বলে প্রচার করে। তার সাথে দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে দেয়। যদিও সে লোক যেনা থেকে তওবা করে, লজ্জিত অনুতপ্ত হয়। সে যত তওবাই করুক আর যত লজ্জিত অনুতপ্তই হোক, কিন্তু মানুষের মনে তার পাপাচারের যে ধারণা এসে গেছে তা দূরীভূত হওয়া খুবই কষ্টকর। অথচ আলেম, সম্মানিত সদ্বংশজাত যারা সকাল সন্ধ্যা মানুষের গীবত করে, তাদেরকে কিন্তু কেউ ফাসেক পাপাচারী বলে মনে করে না, তাদের দুর্নাম করে না; বরং সবাই গীবতের মজলিসে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করে এবং নিজেদের পরকাল বিনষ্ট করে।

হযরত হাতেম (রঃ) এরশাদ করেন— ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي مَجْلِسٍ فَالرَّحْمَةُ عَنْهُمْ مَصْرُوفَةٌ ذِكْرُ الدُّنْيَا وَالضَّحْكُ وَالْوَقِيْعَةُ فِي النَّاسِ —তিন মজলিস এমন, যাতে আল্লাহ তাআলার রহমত নাযিল হয় না। প্রথম— যে মজলিসে পার্থিব আলোচনা হয়, দ্বিতীয়— যে মজলিসে হাসি কৌতুক হয়, তৃতীয়— যে মজলিসে গীবত হয়।

গীবত এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا

—তোমরা পরস্পরে ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করো না, গীবত করো না, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না, আর আল্লাহর বান্দারা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

কেউ কেউ تَدَابُرٌ শব্দের অর্থ বলেছেন, দুই জনের সাক্ষাত হলে উভয়ই ঈর্ষাবশতঃ পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। —(হাকেম—কিতাবুল বেররে ওয়াসসেলাহ)

উপদেশ

যেসব বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, বর্তমানকালে তা সবই ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, অথচ প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করে। এমনকি সন্তান তার মায়ের সাথে ঝগড়াঝাটি করে, তার দুর্নাম করে। ছাত্র শিক্ষকের প্রতি বিদ্বেষে লিপ্ত রয়েছে। সুযোগ হলে বলেই বসে, আমি অমুকের ছাত্র নই। এক ভাই আরেক ভাইয়ের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। ভাইয়ের গীবত করে নিজের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করে। পরস্পর বিদ্বেষ পোষণকারী দুই জনের দেখা সাক্ষাত হয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে নেবার ঘটনা ঘটে। একে অন্যকে সালাম করে না। তার দিকে মুখ ফেরায় না। আর এ ধরনের বিদ্বেষ পোষণের ঘটনা আত্মীয় স্বজনের মাঝেই বেশী। প্রত্যেকেই চায়, আমি আমার অমুক আত্মীয় থেকে সম্মান মর্যাদায় উচ্চস্তরে উপনীত হই। প্রত্যেকেই নিজের নিকটবর্তীদের সাথে এমন ধরনের কথাবার্তা বলে, যাতে তার সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরে ঝগড়াঝাটি বাধে। যদিও আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি খেয়াল রাখা সবার জন্যই জরুরী।

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ি না এবং ফরয রোযা ব্যতীত আর কোন রোযা রাখি না। আমি গরীব মানুষ, সদকাও দেই না, হজ্জও করি না। মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? কেননা, জান্নাতে যাওয়ার কোন কাজই আমার দ্বারা হয় না। লোকটির জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি আমার সাথে জান্নাতে যাবে— যদি তুমি দুই বস্তু হতে নিজের অন্তরকে সুসংরক্ষিত রাখ। তার একটি হচ্ছে মিথ্যা এবং অপরটি হচ্ছে গীবত। আর নিজের চক্ষু দুইটি বস্তু হতে বাঁচিয়ে রাখবে, এক— কোন হারাম বস্তুর প্রতি তাকাবো না, দুই— কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপমান অপদস্থ করার দৃষ্টিতে দেখবে না। এরূপ করতে পারলে তুমি জান্নাতে যাবে এবং আমার সাথেই যাবে।
— (এহইয়াউল উলূম)

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে, এ হাদীসের আলোকে গীবত পরিত্যাগ করা নামায রোযার চাইতেও উত্তম— যেমন প্রশ্নকারী উক্ত সাহাবী (রাঃ) মনে করতেন। গীবতকে মৃতের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামের নিকট গীবত পরিত্যাগ নামায রোযা হতেও উত্তম ছিল। অতএব প্রমাণিত হল, গীবত পরিহার ফরয নামায এবং ফরয রোযা হতে উত্তম। সুতরাং নফল এবাদত তো অনেক দূরের কথা।

পঞ্চম শাখা

গীবতের ক্ষতি

গীবত হতে পার্থিব এবং দ্বীনী অনেক ক্ষতির সৃষ্টি হয়। গীবতকারী خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ (দুনিয়ার ক্ষতি এবং আখেরাত)-এর ক্ষতির উপমা হয়।

প্রথম ক্ষতি— দোআ কবুল না হওয়া

যে অত্যধিক গীবত করে সে খুব কমই অনুতপ্ত লজ্জিত হয়। এ জন্য তার দোআ কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষে না।

ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) তাম্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থের হাসাদ (ঈর্ষা বিদ্বেষ) অধ্যায়ে এরশাদ করেন—

ثَلٰثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ اٰكِلُ الْحَرَامِ وَمِكْثَارُ الْغِيْبَةِ وَمَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ بُخْلٌ اَوْ حَسَدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ

— তিন ব্যক্তির দোআ কবুল হয় না। এক— হারাম ভক্ষণকারী, দুই— যে অত্যধিক গীবতকারী, তিন— যে মুসলমানের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা কৃপণতা করে। নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে—

লোকেরা হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, জনাব! কি ব্যাপার? আমরা দোআ করি, অথচ কবুল হয় না। তিনি বললেন, এর কারণ, তোমাদের অন্তর মৃত। তারা জিজ্ঞেস করল, অন্তর মৃত হওয়ার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের আটটি দোষ রয়েছে, যা অন্তরের সজীবতা অবশিষ্ট রাখেনি, তাই তোমাদের দোআ কবুল হয় না।

এক— তোমরা আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব মর্যাদা সম্পর্কে জান, তাঁর শক্তি কুদরত সম্পর্কেও অবগত, অথচ তাঁর অধিকার আদায় এবং নির্দেশ পালনে ত্রুটি কর।

দুই— তোমরা কোরআন তেলাওয়াত কর, অথচ কোরআনের বিধান অনুযায়ী আমল কর না।

তিন— মুখে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রীতি ভালবাসা প্রকাশ কর, অথচ তাঁর হাদীস অনুযায়ী আমল কর না। প্রীতি ভালবাসার দাবী হচ্ছে যাকে ভালবাসা হয় তার সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা, তার চালচলন অবলম্বন করা।

চার— তোমরা মুখে বল, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি, এবাদতের মাধ্যমে তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। অথচ মানুষ যাকে ভয় করে, তা হতে নিজের মুক্তির চিন্তা ভাবনা করে।

পাঁচ— আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا (শয়তান তোমাদের শত্রু, তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর)। অথচ তোমরা গোনাহে নিজেদের সময় ব্যয় কর, শয়তানকে বন্ধু বানাও।

ছয়— তোমরা মুখে বল, আমরা জাহান্নামকে ভয় করি, অথচ সদা সর্বদা গোনাহ করে নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছ।

সাত— তোমরা জান্নাতে যাওয়ার কামনা বাসনা পোষণ কর, অথচ এ জন্য কোন পাথেয় সংগ্রহ কর না।

আট— যখন তোমরা জাগ্রত হও, তখন নিজের দোষ পিছনে ফেলে দাও, তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না, মানুষের দোষ ত্রুটি নিজের সামনে রাখ, মানুষের নিন্দাবাদ কর, দুর্নাম রটাও। এ সব কারণে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয় না। ফলতঃ তোমাদের দোআও কবুল হয় না।

দ্বিতীয় ক্ষতি—

আমলনামা থেকে নেকী কমে যায়

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন—

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى كِتَابَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَرٰى فِيْهِ حَسَنَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَمِلَهَا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَنّٰى لِيْ كَذَا فَيُقَالُ لَهٗ هٰذَا بِمَا اغْتَابَكَ النَّاسُ وَاَنْتَ لَا تَشْعُرُ

— কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামায় নেকী দেখে খুশী হবে। আর যখন বদীর প্রতি দৃষ্টি পড়বে তখন অস্থির হবে। কিছু লোক নিজেদের আমলনামায় এমন নেকীসমূহ দেখতে পাবে যা তারা দুনিয়ায় করেনি। তারা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করবে, ইয়া আল্লাহ! এসব নেক কাজ তো আমরা করিনি। এগুলো কিভাবে আমাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত হল? আল্লাহ বলবেন, যদিও তোমরা এসব নেক কাজ করনি, কিন্তু যারা তোমাদের গীবত করেছে, তাদের আমলনামা থেকে এসব নেকী মিটিয়ে তোমাদের আমলনামায় লেখে দেয়া হয়েছে আর তাদের গীবত সম্পর্কে তোমরা অবহিত ছিলে না। —(তাম্বীহুল গাফেলীন, আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) আরও এরশাদ করেন—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطٰى كِتَابَهٗ مُنْشَرًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ فَاَيْنَ حَسَنَاتِيْ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِيْ صَحِيْفَتِيْ فَيَقُوْلُ لَهٗ مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ النَّاسَ

— কিছু লোক কেয়ামতের মাঠে খোলা আমলনামা লাভ করবে। তারা নিজেদের আমলনামা দেখে বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমরা দুনিয়ায় অমুক

অমুক ভাল কাজ করেছি, সেগুলো কোথায় গেল, আমার আমলনামায় সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না কেন? জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, যেহেতু দুনিয়ায় তুমি মানুষের গীবত করেছিলে। এ কারণে সেসব ভাল কাজ তোমার আমলনামা থেকে মুছে যাদের গীবত করেছ তাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। — (আততারগীব ওয়াততারহীব)

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন— إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ — আল্লাহ তাআলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না। সুতরাং যার উপর যা হক পাওনা থাকবে, তিনি তা আদায় করে দেবেন। তাই কেউ কারো গীবত করলে তার নেকী নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তাকে দেয়া হবে।

এখানে একটি দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব নিঃসম্বল ব্যক্তি কে? তাঁরা জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিঃস্ব নিঃসম্বল সে, যার কোন সম্পদ নেই। তিনি বললেন, এ তো সম্পদের বিচারে নিঃস্ব। প্রকৃত নিঃস্ব সে, যে কেয়ামতের দিন অনেক অনেক নামায রোযা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, বিপরীতপক্ষে তার নিকট মানুষের হক রয়েছে। সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে। সুতরাং সব দাবীদার তাদের হক দাবী করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে। আল্লাহ তাআলা সেদিন ন্যায়বিচারের আসনে সমাসীন হয়ে সকলকে খুশী করবেন। প্রত্যেক দাবীদারকে তার হক পৌঁছে দেবেন। যার উপর বিভিন্ন মানুষের হকের দাবী রয়েছে, তার পুণ্য কর্মসমূহ নিয়ে দাবীদারদেরকে দিতে থাকবেন। এতে তার বিপুল এবাদতে ক্রমে ঘাটতি হতে শুরু করবে। যখন তার সব পুণ্য শেষ হয়ে যাবে, তখন দাবীদারদের বদীসমূহ তার উর চাপানো হতে থাকবে। এভাবে তার আমলনামা হকের দাবীদারদের গোনাহের কালিমায় কালো করে দেয়া হবে। অবশেষে সব দাবীদার নিজ নিজ হক নিয়ে জান্নাতে আর সে নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে যাবে। এ লোকই প্রকৃত নিঃস্ব।

সেদিন যে হিসাবের চক্রে পড়বে সে নিতান্ত নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থার শিকার হবে। —(বাগাভী—মাআলেমুত তানযীল)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রঃ) বলেন, একদিন আমি হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। লোকেরা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর গীবত শুরু করে। আমি হযরত সুফিয়ান (রঃ)-কে

উদ্দেশ করে বললাম, ইমামের (আবু হানীফা) মর্যাদা বিস্ময়কর! তিনি কারো গীবত করেন না, কারো দুর্নাম করেন না। জবাবে সুফিয়ান সওরী (রঃ) বললেন, জ্ঞানবান বিবেকসম্পন্নদের অবস্থা এমনই। তারা নিজেদের পুণ্য কর্মসমূহের উপর অন্যদেরকে চাপান না। কারো গীবত করেন না।

—(মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা, তারীখে ইবনে খাল্লেকান)

তৃতীয় ক্ষতি—

আমলনামায় পাপের আধিক্য হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

إِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَإِنَّ فِيْهَا ثَلَاثُ اٰفَاتٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَا يُقْبَلُ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ.

—তোমরা গীবত থেকে বাঁচ, কেননা তাতে তিনটি বিপদ রয়েছে। এক— গীবতকারীর দোআ কবুল হয় না, দুই— তার কোন নেক কাজই কবুল হয় না, তিন— তার আমলনামায় পাপাধিক্য হয়। —(খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এরশাদ করেন, যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, দুনিয়া নিঃশেষ যয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে একখানে একত্র করে ঘোষণা করবেন, যে কারো নিকট কোন হক পাওনা আছে, সে আস। তখন প্রত্যেকেই খুশী হবে এবং পিতা-মাতা, ভাই বোন ও স্ত্রীর নিকট হক দাবী করবে। এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ

— যখন শিঙ্গায় ফুঁকা হবে, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক মিটে যাবে এবং প্রত্যেকেই পরস্পর থেকে অধিকার দাবী করবে।

কেয়ামতে কেউ কারো কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবে না। সেদিন দুই ধরনের লোক একত্রিত হবে। যে নেক্‌কার পুণ্যকর্মশীল হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি এ লোকের উপর এভাবে করুণা করবেন— তার সব পুণ্য কর্ম যখন অধিকারের দাবীদাররা নিয়ে যাবে, তখন তার মাত্র বিন্দু পরিমাণ পুণ্য থাকবে। তখন ফেরেশতাকুল নিবেদন করবে, ইয়া আল্লাহ! এ লোকের বিন্দু পরিমাণ পুণ্যমাত্র অবশিষ্ট আছে। বাকী সবই অন্যদের অধিকারের দাবী মেটাতে

গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তার অবশিষ্ট বিন্দু পরিমাণ পুণ্যকর্মকে বাড়িয়ে দাও এবং আমার করুণায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে বদকার হবে সে জাহান্নামের যোগ্য সাব্যস্ত হবে। তার অবস্থা হবে— যখন পুণ্যও অবশিষ্ট থাকবে না, আর দাবীদারও অবশিষ্ট থেকে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন, দাবীদারদের গোনাহ্ এ ব্যক্তির আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত কর। ফেরেশতা এ নির্দেশ পালন করবেন এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

—(বাগাভী— মাআলেমুত তানযীল)

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন—

لَعَلَّكَ لَوْحَاسَبْتَ نَفْسَكَ وَاَنْتَ مُوَاظِبٌ عَلٰى نَفْسِكَ بِصِيَامِ النَّهَارِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ تَعَلَّمْتَ اَنَّهُ لَا يَنْقَضِىْ عَنْكَ يَوْمٌ اِلَّا يَجْرِىْ عَلَيْكَ مِنْ غِيْبَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا يَسْتَوْفِىْ جَمِيْعُ حَسَنَاتِكَ

— যদি তুমি সব সময় দিবাভাগে রোযা রাখ এবং রাতে এবাদত কর; অতঃপর যদি লক্ষ্য কর, তা হলে সারা দিনে তোমা কর্তৃক মুসলমানদের যে গীবত হয়েছে তা তোমার দিবাভাগের রোযা এবং রাতের এবাদতের পুণ্য থেকে বেড়ে যাবে এবং এ সব পুণ্য বরবাদ করে দেবে। সুতরাং অন্যের অধিকারের বোঝা থেকে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। যদিও এবাদত এবং পুণ্য কর্ম কম হোক। কেননা, বান্দার অধিকার বিনষ্ট করা আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর।

তাই হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন—

اَلْكَبَائِرُ مَاكَانَ فِيْهِ الْمَظَالِمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَثِيْرُ الْعَفْوِ

— বান্দাদের মাঝে যে গোনাহ্ হয় তা কবীরা, যদিও এ গোনাহের কারণে বান্দার সামান্যতম কষ্টও হয়, আর আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ অমান্য-জনিত যে গোনাহ তা সগীরা। কেননা, আল্লাহ তাআলা অত্যধিক ক্ষমাশীল, তাই তিনি তাঁর সাথে বান্দার কৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করবেন। পক্ষান্তরে বান্দা তার অধিকার দাবী করবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى أَنْتَ أَخَذْتَ لَبِنَةً مِنْ حَائِطِيْ وَأَخَذْتَ خَيْطًا مِنْ ثَوْبِيْ

—কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত ধরে বলবে, আ মার এবং তোমার মাঝে আল্লাহই বিচারক। যার হাত ধরা হয়েছে, সে ব বে, কে তুমি? আমি তোমাকে চিনি না। যে হাত ধরেছে সে বলবে, তুমি আমার দেয়াল থেকে একখানা ইট খসিয়ে নিয়েছ, আমার কাপড় থেকে সুতা বের করেছ, আমি এখন তোমার নিকট তা দাবী করছি। —(ইমাম গাযালী—গীবত অধ্যায়)

ঘটনা

হযরত কাহমাস বিন হাসান বিন বেশর (রঃ) একদিন বলতে লাগলেন, আমি এক গোনাহ করেছি, যার জন্য চল্লিশ বছর থেকে লজ্জিত হয়ে আছি এবং সর্বদা কান্নাকাটি করছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জনাব! সেটি কোন্ গোনাহ? জবাবে বললেন, আমি একদা মেহমানের জন্য ঘরে মাছ এনেছিলাম এবং তা খাওয়ার পর প্রতিবেশীর বিনানুমতিতে তার দেয়াল থেকে মাটি নিয়ে হাত পরিষ্কার করেছি। এ গোনাহের কারণে আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত সর্বদা কান্নাকাটি করছি। —(তাম্বীহুল গাফেলীন— যুনূব অধ্যায়)

উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে হিতোপদেশ গ্রহণ সবারই কর্তব্য। যদি নিজের উপর কারও কোন অধিকারের দাবী থাকে তা হলে দুনিয়াতেই তা মাফ করিয়ে নিয়ে কেয়ামতের দিনের জন্য নিজেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে নেয়া উচিত। অন্যথায় কেয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে। অন্যের অধিকারের দাবী নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে সেদিন কোন এবাদতই কাজে আসবে না।

চতুর্থ ক্ষতি—

পুণ্য কর্মসমূহ কবুল না হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَا النَّارُ فِى الْيُبْسِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغِيْبَةِ فِىْ حَسَنَاتِ الْعَبْدِ

—আগুন এত তাড়াতাড়ি কোন শুকনা বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করে না, যত তাড়াতাড়ি পুণ্য কর্মসমূহের উপর গীবতের প্রতিক্রিয়া হয়।

—(এহইয়াউল উলূম— এলাজুল গীবত অধ্যায়)

হযরত খালেদ বিন মেদান (রঃ) হযরত মোআয (রাঃ)-কে বললেন, হে মোআয! এমন কোন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন। হযরত খালেদ বিন মেদান (রাঃ)-এর কথায় হযরত মোআয (রাঃ) খুব কাঁদেন এবং এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে এ রয়েছে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে মোআয! যারা আমলের সংরক্ষক এবং যেসব ফেরেশতা আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন, কখনও এমন হয় যে, ফেরেশতা কারো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের নেক আমলসমূহ আসমানে নিয়ে যান, আর সে আমলসমূহ সূর্যের মত চমকিত হয়, আমলবাহী ফেরেশতা প্রথম আসমানে উপনীত হয়ে তা দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যেতে চান, তখন প্রথম আসমানে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন; এসব আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মার এবং তাকে ক্ষমা করা হয়নি বলে সংবাদ দাও। কেননা, সে মুসলমানদের গীবত করত। সুতরাং তার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। —(তাম্বীহুল গাফেলীন—তাফাক্কুর অধ্যায়)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন—

وَاللّٰهِ اَلْغِيْبَةُ اَسْرَعُ فِىْ دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْاَكْلَةِ فِى الْجَسَدِ

—আল্লাহর শপথ, জখম শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চাইতেও ত্বরিত গতিতে গীবত মোমেনের দ্বীনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যখনই কোন মানুষ কারো গীবত করল, তখনই তার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হল। তার পুণ্য কর্মসমূহ কবুল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হল।

—(এহইয়াউল উলূম— গীবত অধ্যায়)

পঞ্চম ক্ষতি—

কেয়ামতে অধিকারের দাবীদারদের ফরিয়াদ

একদিন জনৈক ব্যক্তি যাহেদ (রঃ)-এর সম্মুখে হাজ্জাজের গীবত এবং তার জুলুম অত্যাচারের বর্ণনা করতে শুরু করে। তখন যাহেদ (রঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা যথার্থ ন্যায়বিচারক। তিনি যেমন হাজ্জাজ থেকে অত্যাচারিতদের বিনিময় গ্রহণ করবেন, তেমনি হাজ্জাজের গীবতকারীদের থেকেও তার গীবতের বিনিময় গ্রহণ করবেন যখন সে তা দাবী করবে।

গীবতের কারণে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং বর্তমানকালের লোকদের অবস্থা

এক পরহেযগার লোক স্ত্রীর জন্য তুলা খরিদ করে আনেন। স্ত্রী তা দেখে বলল, বিক্রেতারা আপনাকে ঠকিয়েছে। এ কথা শুনতেই সে লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জনাব! আপনি কেন স্ত্রীকে তালাক দিলেন? দরবেশ বললেন, সে তুলা বিক্রেতাদের গীবত করেছে। কেয়ামতের দিন সকলেই তার নিকট অধিকার দাবী করে তাকে পাকড়াও করবে। উপস্থিত লোকজন বলবে, এসব লোক অমুকের স্ত্রীর নিকট অধিকার দাবী করছে। এতে আমি লজ্জিত হব। তাই আমি তাকে তালাক দিয়েছি, যাতে মানুষ এ কথা মুখে তুলতে এবং এ স্ত্রীকে আমার সাথে সম্পর্কিত করতে না পারে। —(তাম্বীহুল গাফেলীন— গীবত অধ্যায়)

বাস্তবে এক্ষেত্রে তুলা বিক্রেতাদের দোষ বর্ণনা গীবত নয়। কেননা, গীবত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই অজ্ঞাত ব্যক্তির গীবত বৈধ। আর উল্লিখিত দরবেশের স্ত্রীও অজ্ঞাত তুলা বিক্রেতার দোষ বর্ণনা করেছিল। কেননা, বেচারী কারো নামোল্লেখ করেনি, কিন্তু দরবেশ তাঁর পরিপূর্ণ পরহেযগারীবশতঃ একেও গীবত ভেবে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন।

গ্রন্থকার বলেন, হয়ত দরবেশ বলেছিলেন, অমুক লোক থেকে তুলা কিনে এনেছি। সুতরাং স্ত্রী যখন বিক্রেতার দোষ বর্ণনা করল তখন তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত হয়ে গেল। তাই দরবেশ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন।

আলোচ্য ঘটনা থেকে জানা গেল, খারাপ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা, তার সাথে সম্পর্কজনিত আচরণ করাও খারাপ। আর বেশী বেশী দেখা সাক্ষাতেরও একটা খারাপ প্রভাব রয়েছে। সুতরাং মন্দ স্ত্রীর সংসর্গের প্রভাব স্বামীর মাঝেও সংক্রমিত হবে। কেননা, খারাপ সংসর্গের প্রভাব একটা প্রসিদ্ধ বিষয়। আর মন্দ সাথী-বন্ধু সাপের চাইতেও বেশী ক্ষতিকর। অথচ বর্তমানকালের লোকদের অবস্থা বিস্ময়কর। স্ত্রী পাপাচারিণী হলেও তারা তাকে পরিত্যাগ করে না। তাদের সংসর্গ অবলম্বন করে চলে। এরূপ স্ত্রী পরিত্যাগ করাকে লজ্জার কারণ বলে মনে করে। তাদেরকে পরিত্যাগ তো করেই না, এমনকি পাপ পরিহারের জন্য উপদেশও প্রদান করে না।

ষষ্ঠ ক্ষতি—

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হাশর ময়দানে বার মনযিল হবে এবং প্রত্যেক মনযিলে একেকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ

মনযিলগুলোর চতুর্থ মনযিলে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি দুনিয়ায় কারো গীবত না করে থাকে তা হলে তাকে আগে বাড়তে দেয়া হবে। অন্যথায় এ মনযিলেই এক হাজার বছর পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখা হবে।— (কিতাবু আহওয়ালিল উম্মত)

এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

ইবনে সিরীন (রঃ)-এর সম্মুখে একদিন আওফ হাজ্জাজের গীবত শুরু করে দেন। ইবনে সিরীন বললেন, হে আওফ! হাজ্জাজ জালেম, যদিও এ জন্য আল্লাহ তাআলা মজলুমদের অধিকার হাজ্জাজ থেকে আদায় করবেন, তার থেকে জুলুমের হিসাব নেবেন, কিন্তু তার গীবত করা অনুচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবতকারীদের থেকেও হাজ্জাজের পক্ষ হয়ে হিসাবে নেবেন। —(এহইয়াউল উলূম— গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত দাউদ তায়ী (রঃ) এক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বেহুশ হয়ে যান। তাঁর বেহুশ অবস্থার অবসান হলে লোকজন জিজ্ঞেস করল, জনাব! এ জায়গায় এসে আপনার বেহুশ হয়ে পড়ার কারণ কি? তিনি বললেন, এ স্থানে এসে আমার স্মরণ হল, এখানেই আমি এক ব্যক্তির গীবত করেছি। সুতরাং আমার আল্লাহ তাআলার হিসাব গ্রহণের কথা স্মরণ হয়ে যায়, তাই আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। —(নুযহাতুল মাজালেস— গীবত অধ্যায়)

তৃতীয় ঘটনা

একদা আবেদদের এক দল সফরের উদ্দেশে বের হন। এ দলে হযরত আতা (রঃ)-ও ছিলেন। আবেদ দল এমনভাবে এবাদত করতেন যে, এবাদতের আধিক্যজনিত পরিশ্রমে তাঁদের চক্ষু কোটরাগত হয়ে পড়ে। পদদ্বয় ফুলে যায়। এমনকি তাঁরা এমন হালকা দুর্বল হয়ে পড়েন যেন খরবুজার ছাল। দেখলে মনে হত যেন তারা সবেমাত্র কবর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পথিমধ্যে এক দরবেশ বেহুশ হয়ে যান। শীতের দিন হওয়া সত্ত্বেও ভীতি অস্থিরতার কারণে তাঁর মাথা থেকে ঘাম ঝরছিল। হুশ ফেরার পর লোকজন তাঁকে বেহুশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ জায়গা অতিক্রম করতেই স্মরণ হল, আমি অমুক দিন এ জায়গায় গোনাহ করেছি। গোনাহের কথা স্মরণ হতেই আমার অন্তরে হিসাবের ভীতি আসে, আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। —(এহইয়াউল উলূম—আহওয়ালুল খায়েফীন অধ্যায়)

চতুর্থ ঘটনা

একদিন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) রাস্তা দিয়ে চলছিলেন। চলাকালে তাঁর পা এক বালকের পায়ের সাথে লেগে যায়। বালকটি বলল, ওহে পথচারী! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। আপনি কি কেয়ামতের দিনের হিসাব এবং আল্লাহ তাআলার বিনিময় গ্রহণের ভয় করেন না? বিনিময় এবং হিসাবের কথা শুনতেই তাঁর উপর ভীতি অস্থিরতা ছেয়ে যায়, তিনি বেহুশ হয়ে যান।

—(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস—এজতেনাবুয যুলম অধ্যায়)

বস্তুতঃ আল্লাহর হিসাব গ্রহণ বেহুশ হওয়ার এবং তাঁর শাস্তি ভীত হওয়ার স্থান। যদি কাউকে তার অপকর্মসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়, তা হলে তার মানস-প্রকৃতি কেমন ঘাবড়ে যায়। তখন মন চায়, প্রাণবায়ু এক্ষুণি বের হয়ে যাক। সুতরাং হাশর ময়দানের হিসাবের কথা জিজ্ঞেস করারই বা কি আছে! সেদিনের ভীতি অস্থিরতার তো কোন সীমা সরহদই নেই।

সপ্তম ক্ষতি—

কেয়ামতে দুঃখ লজ্জায় পতিত হওয়া

দুনিয়ায় যদি কেউ কাউকে গালি দেয় আর যাকে গালি দেয়া হয় সে যদি গালিদাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ দায়ের করে, তা হলে গালিদাতা কেমন দুঃখিত লজ্জিত হয়! কেননা, সে যদি আদালতে গালি দেয়ার কথা স্বীকার করে তা হলে শাস্তি পাবে। আর যদি অস্বীকার করে তা হলে অভিযোগকারী সাক্ষী উপস্থাপন করবে। ফলে তার গালি দেয়া প্রমাণ হয়ে যাবে এবং তার জীবনের উপর বিপদ নেমে আসবে। অনুরূপ কেয়ামতের দিন যখন কেউ কারো উপর দাবী করবে যে, সে আমার গীবত করেছে, আর অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আল্লাহ তাআলা যখন তার নিকট দাবীকৃত বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তখন সে যদি স্বীকার করে তা হলে জনসম্মুখে লজ্জিত হবে। আর অস্বীকার করলে আল্লাহ তাআলা তার অঙ্গসমূহকে নির্দেশ করবেন আর সেগুলোকে কথা বলার শক্তি দান করবেন এবং অভিযুক্তের প্রত্যেক অঙ্গ জনসম্মুখে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে তাকে লজ্জিত করবে। তবে হাঁ, যারা পুণ্যকর্মশীল, অথবা যাদের উপর আল্লাহ

তাআলার করুণা হবে, তারা মুক্তি পাবে। তাই দরবেশ শ্রেণীর লোকেরা কেয়ামতে লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট হিসাবের জন্য দাঁড়ানোকে অত্যন্ত ভয় করতেন।

আবু সোলায়মান দারানীর জবাব

হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রঃ)-এর ইনতেকালের সময় ঘনিয়ে এলে উপস্থিত লোকেরা বলতে লাগল, হে সোলায়মান! এ তো খুশীর সময়। আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহর দরবারে তাশরীফ নিচ্ছেন। আপনার কোন ভয় শংকা নেই। কেননা, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ বান্দার সব গোনাহ মাফ করে দেন। আবু সোলায়মান (রঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, সগীরা গোনাহের হিসাব নেবেন এবং কবীরা গোনাহের জন্য শাস্তি দেবেন। সুতরাং যেমন তাঁর রহমতের আশাবাদী থাকা কর্তব্য তেমনি কর্তব্য তাঁর শাস্তি হতে ভয়ার্ত থাকা।

—(এহইয়াউল উলূম—কালামুল মোহতাযেরীন অধ্যায়)

অষ্টম ক্ষতি—

কেয়ামতে গীবতকৃতের গোশত ভক্ষণ

উপরে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে কারো গীবত করবে, কেয়ামতে যার গীবত করা হয়েছে তাকে মৃতরূপে উপস্থাপন করা হবে এবং গীবতকারীকে হুকুম দেয়া হবে, যেভাবে জীবদ্দশায় তুমি তার গোশত খেয়েছ, এখন মৃত্যুর পরও তার গোশত খাও। সুতরাং গীবতকারী মৃতের গোশত খাবে এবং মুখ অত্যন্ত বিকৃত করবে।

—(সীরতে আহমদিয়া—তাবরানী হতে)

নবম ক্ষতি—

কেয়ামতের দিন নিজের গোশত ভক্ষণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজ হতে প্রত্যাবর্তন করে এরশাদ করেন—

مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يَقْطَعُ اللَّحْمَ مِنْ جُنُوبِهِمْ ثُمَّ يَلْقَمُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ كُلُوْا مَا كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ مِنْ لُحُوْمِ اِخْوَانِكُمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ

هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ مِنْ اُمَّتِكَ الْهَمَّازُوْنَ وَاللَّمَّازُوْنَ يَعْنِى الْمُغْتَابِيْنَ

—যখন আমি মেরাজে গমন করি, তখন কিছু লোককে দেখতে পেয়েছি, যাদের পার্শ্বদেশ হতে গোশত কেটে মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলছেন, যেভাবে তোমরা দুনিয়ায় আপন ভাইদের গোশত ভক্ষণ করতে, এখন তেমনি নিজের গোশত ভক্ষণ কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক, যারা মানুষের গীবত করত।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—গীবত অধ্যায়)

দশম ক্ষতি—

কেয়ামতের দিন নিজের শরীর নখ দ্বারা আঁচড়ানো

উপরে আবু দাউদ শরীফে মেরাজের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, মেরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীদেরকে দেখেছেন, তারা নখ দ্বারা নিজেদের শরীর আঁচড়াচ্ছে এবং কঠিন আযাবে আবদ্ধ রয়েছে।

একাদশতম ক্ষতি—

জাহান্নামে খুজলী রোগাক্রান্ত হওয়া

উপরে হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যারা হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়তে কোন মুসলমানের গীবত করবে, জাহান্নামে তাদের শরীরে খুজলী হবে।

দ্বাদশতম ক্ষতি—

জান্নাতে সকলের পরে এবং জাহান্নামে সর্বাগ্রে গমন

গীবতকারী যদি গীবত হতে তওবা করে মরে, তা হলে যদিও সে জান্নাতে যাবে, কিন্তু সবার পরে; আর যদি তওবা ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করে তা হলে সর্বাগ্রে জাহান্নামে যাবে।

মোল্লা মিসকীন হারাবী (রঃ) 'রওযাতুল' ওয়ায়েজীন' গ্রন্থে লেখেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফাসমূহে লিখিত ছিল, হে বনী আদম! গীবত পরিহার কর, তা হলে জান্নাত তোমার জন্য আগ্রহী হবে।

ত্রয়োদশতম ক্ষতি—
গীবতকারী আখেরাতে বানর হবে

উপরে নুযহাতুল মাজালেস গ্রন্থ হতে হযরত হাতেম আসাম্ম (রঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, গীবতকারী জাহান্নামে বানরে পরিণত হবে।

চতুর্দশতম ক্ষতি—
গীবতকারীর অত্যধিক কবর আযাব হবে

উপরে হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এক তৃতীয়াংশ কবর আযাব গীবতের কারণে হবে।

পঞ্চদশতম ক্ষতি—
গীবতকারী মোনাফেকের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে যায়

জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজের গীবত করলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, হাজ্জাজ এখানে উপস্থিত থাকলে কি তুমি তাকে মন্দ বলতে? সে বলল, না। তখন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, কারো সাক্ষাতে তাকে সম্মান প্রদর্শন এবং অসাক্ষাতে তার গীবত করা— একে আমরা মোনাফেকী বলে মনে করতাম।

ষোড়শতম ক্ষতি—
গীবতকারীর নির্ভরযোগ্যতা বিশ্বস্ততা চলে যায়

যে জনসম্মুখে কারো গীবত করে, তার বিশ্বস্ততা চলে যায়। যাদের সম্মুখে গীবত করা হয় তারা মনে করে, লোকটির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, সে অনির্ভরযোগ্য। সে আজ যেমন আমাদের সামনে অমুকের গীবত করেছে, তেমনি অন্যদের সামনেও আমাদেরকে মন্দ বলবে।

এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত যাহেদ (রঃ)-এর সম্মুখে কারো গীবত করলে তিনি বললেন, ওহে! তুমি আমার সামনে কারো গীবত করে তোমার নিজের সম্বন্ধে আমাকে মন্দ ধারণা পোষণকারী বানিয়ো না।

সপ্তদশতম ক্ষতি—
গীবত দ্বারা মুসলমানের প্রতি জুলুম করা হয়

এক ব্যক্তি এক প্রাজ্ঞ জ্ঞানীকে বললেন, আমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদান করুন। জবাবে জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন, لَا تَجُفْ رَبَّكَ وَلَا تَجُفْ

الْخَلْقَ وَلَا تَجُفْ نَفْسَكَ — তিন বিষয় নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে লও। (১) আল্লাহর উপর জুলুম করো না [আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবাদত করলে এবং আল্লাহর এবাদতে লোক দেখানো মনোভাব প্রবিষ্ট করালেও তাঁর উপর জুলুম করা হয়]। (২) গীবত করে আল্লাহর সৃষ্টির উপর জুলুম করো না। (৩) ফরযসমূহ আদায় এবং এবাদতে কমতি করে নিজের উপর জুলুম করো না। —(তাম্বীহুল গাফেলীন— যুনূব অধ্যায়)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالضَّرُّ لِعِبَادِ اللّٰهِ وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنْ خَيْرٍ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَلِلنَّفْعِ لِعِبَادِ اللّٰهِ

—দুইটি বৈশিষ্ট্যের চাইতে মন্দ কোন বৈশিষ্ট্য নেই— আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহর বান্দাদের ক্ষতি সাধন করা। আর দুইটি বৈশিষ্ট্যের চাইতে উত্তম কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তা হচ্ছে, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর বান্দাদের উপকার সাধন করা।

—(এহইয়াউল উলূম—হুকুকুল মোসলেম আলাল মোসলেম অধ্যায়)

অষ্টাদশতম ক্ষতি—

গীবতে আল্লাহর দুশমন ইবলীস অত্যন্ত খুশী হয়

একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইবলীস শয়তানকে দেখতে পেলেন, তার এক হাতে মধু এবং আরেক হাতে ছাই ভস্ম রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) শয়তানকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বলল, এ ছাইভস্ম আমি এতীমদের চেহারায় নিক্ষেপ করি, যাতে তাদের চেহারা বিশ্রী হয়ে যায় এবং মানুষ তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে, তাদের খোজ খবর না রাখে। আর হস্তস্থিত এ মধু আমি গীবতকারীদের মুখে নিক্ষেপ করি। কেননা, আমি গীবতকারীদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট প্রসন্ন চিত্ত হয়ে থাকি।

—(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস—গীবত অধ্যায়)

শয়তানের সন্তুষ্ট প্রসন্ন চিত্ত হওয়া দুই কারণে অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রথমতঃ শয়তান আল্লাহ তাআলার অবাধ্য, তাই তার প্রতি আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত। সুতরাং শয়তানের সন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলার ক্রোধান্বিত হওয়ার

কারণ। দ্বিতীয়তঃ শয়তান মানুষের প্রাণের দুশমন। কেননা, সে সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লেগে থাকে, যা প্রকারান্তরে মানুষের জীবন হরণের চাইতেও বেশী ক্ষতিকর।

ঊনবিংশতিতম ক্ষতি—

গীবতে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়

গীবত দ্বারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদে গীবত নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়ের শরণাপন্ন হওয়া প্রকারান্তরে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও নাফরমানী করা এবং তাঁর ভীতি পরিত্যাগ করা। আর আল্লাহর নাফরমানী ও ভীতি পরিত্যাগ মানুষের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী করে তোলে এবং এ আচরণ তার মানসিক পংকিলতারও কারণ। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। তাই তাঁর নাফরমানী খুবই মন্দ।

অতএব, হযরত হাতেম আসাম্ম (রঃ) বলেন, তোমার গোনাহ করার ইচ্ছা হলে এমন স্থানে তা কর যেন আল্লাহ তাআলা দেখতে না পান। নতুবা গোনাহ করো না।

হযরত লোকমান (আঃ) নিজের ছেলেকে অনেকগুলো হিতোপদেশ প্রদান করেন। তন্মধ্যে এও রয়েছে, হে বৎস! তোমার গোনাহ করার ইচ্ছা হলে তার জন্য এমন স্থান খোজ যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা দেখতে না পান। যদি এমন জায়গা না পাও তা হলে গোনাহ হতে বেঁচে থাক। —(তাম্বীহুল গাফেলীন—তাওয়াক্কুল অধ্যায়)

বিংশতিতম ক্ষতি—

গীবতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়

গীবতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা হয়। কারণ, তিনি মানুষকে গীবত হতে খুব বেশী নিষেধ করতেন এবং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামকে সাবধান করতেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুকাল সন্নিকটবর্তী হলে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে তিনি যে ভাষণ দেন, তাতেও গীবত হতে নিষেধ করেন এবং গীবতকারীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী বলে এরশাদ করেন।

একবিংশতিতম ক্ষতি—

গীবতের কারণে রোযা মাকরূহ হয়

গীবতকারী রোযাদার হলে তার রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। বরং হাদীস গ্রন্থ মেশকাত শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ আশেআতুল লামেআতে বলা হয়েছে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মতে, গীবতের কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর অভিমত

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, خَصْلَتَانِ تُفْسِدَانِ الصَّوْمَ وَالْغِيْبَةُ وَالْكِذْبُ — এমন দুইটি স্বভাব রয়েছে, যার কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে, রোযা অবস্থায় গীবত করা এবং মিথ্যা বলা।

— (এহইয়াউল উলূম—আসরারিস সাওম অধ্যায়)

গীবতের কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় রোযা রাখার নির্দেশ দেন

দুই রোযাদার যোহর এবং আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। আসর নামাযের পরে তিনি রোযাদার ব্যক্তিদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা পুনঃ অযু করে যোহর ও আসরের নামায পড় এবং আজকের দিনের রোযা কাযা করো। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেন আমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছ।

—(বায়হাকী—শোআবুল ঈমান, মেশকাত—গীবত অধ্যায়)

গীবতের কারণে রোযা হয় না

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আজ কেউ আমার আদেশ ব্যতিরেকে রোযা ইফতার করবে না। সুতরাং সন্ধ্যায় সবাই আসত এবং আদেশ প্রাপ্ত হয়ে ইফতার করত। এ সময় এক লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ঘরে দুই যুবতী রোযাদার রয়েছে। তারা আপনার কাছে আসতে লজ্জা করছে এবং রোযা ইফতার করার আদেশ প্রার্থনা করছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি দ্বিতীয় বারও নিবেদন করল, এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। সে তৃতীয় বার উক্ত যুবতীদ্বয়ের জন্য ইফতারের আদেশ প্রার্থনা করলে এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, উক্ত যুবতীদ্বয়ের রোযা হয়নি। যে সারা দিন মানুষের গোশত খায়,

মুসলমানের গীবত করে, তার রোযা কি করে হবে? তুমি গিয়ে যুবতীদ্বয়কে এখানে এসে বমি করতে বল। নির্দেশ মোতাবেক যুবতীদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আগমন করে। তারা আসলে তিনি একটি পেয়ালা আনান এবং যুবতীদ্বয়কে তাতে বমি করতে বলেন। তাদের বমি হতে রক্ত বের হল এবং তাতে পুঁজ মিশ্রিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এ যুবতীদ্বয় সারা দিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে। —(এহইয়াউল উলূম—গীবত অধ্যায়)

নিম্নে গীবতের কারণে রোযা বিনষ্ট হওয়ার উক্তি সম্বলিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

أَرْبَعٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ وَيَنْقُضْنَ الْوُضُوْءَ وَيَهْدِمْنَ الْعَمَلَ الْغِيْبَةُ وَالْكِذْبُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالنَّظْرُ اِلٰى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ الَّتِيْ لَايَحِلُّ النَّظْرُ اِلَيْهَا. وَهُوَ يَسْقِيْنَ أُصُوْلَ الشَّرِّ كَمَا يَسْقِي الْمَاءُ أُصُوْلَ الشَّجَرِ

— চার কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়, অযু নষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে, গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা কথন, পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত হারাম করা হয়েছে। এ চারটি বিষয় খারাপ কাজের শিকড় সিক্ত করে, যেমন পানি বৃক্ষসমূহের শিকড় সিক্ত করে। পানি ঢাললে যেমন বৃক্ষসমূহের শিকড় তরতাজা হয়, তেমনি উল্লিখিত চার কারণে খারাপ কাজের শিকড় তরতাজা হয়। —(তাম্বীহুল গাফেলীন— গীবত অধ্যায়)

গীবত রোযা বিনষ্টকারী

রাহমাতুল লিলআলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ اَلْكِذْبُ وَالنَّمِيْمَةُ وَالْغِيْبَةُ وَالْيَمِيْنُ الْكَاذِبَةُ وَالنَّظْرُ بِشَهْوَةٍ

—পাঁচটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তা হল— (১) মিথ্যা বলা, (২) গীবত করা, (৩) চোগলখোরী করা, (৪) মিথ্যা কসম খাওয়া, (৫) কামনা সহকারে পর নারীর প্রতি দেখা।

—(এহইয়াউল উলূম—সাওম পর্ব)

গীবতের কারণে রোযা কবুল হয় না

সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ — রোযা অবস্থায় যে মিথ্যা পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহ তাআলার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির রোযার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, قَوْلِ زُوْرٌ অর্থ হচ্ছে নিরর্থক কথাবার্তা। তা মিথ্যা কথন, গীবত, চোগলখোরী যাই হোক না কেন।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ اِلَّا الْجُوْعُ وَالْعَطْشُ — এমন বহু রোযাদার রয়েছে, যাদের রোযায় ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট বরণ ব্যতীত আর কোন উপকারিতা নেই।

দ্বাবিংশতিতম ক্ষতি—

গীবত শুনার পরে ঈর্ষা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়

যখন মানুষজনের সম্মুখে কারো গীবত করা হয়, তখন শ্রোতাদের মনে যার গীবত করা হয়েছে তার সম্পর্কে মন্দ ধারণার সৃষ্টি হবে, মানুষ তাকে খারাপ জানবে, তার প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করবে। তার শ্রুত দোষের পেছনেই লেগে থাকবে। একবার কারো নিন্দাবাদ শুনতে পেলে মানব মন সে নিন্দাবাদের সাথেই লেগে থাকে। তার ব্যাপারে মন নিঃশংক হয় না।

এক জ্ঞানীর সামনে জনৈক ব্যক্তি এক মুসলমানের গীবত করলে তিনি বললেন, ওহে! আগে আমার মন অবসর নিশ্চিন্ত ছিল। গীবত করে তুমি আমার মনকে এক মুসলমানের প্রতি নিবিষ্ট করে দিলে। এখন তার সম্পর্কে আমার মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। আর আমার নিকট তুমিও অভিযুক্ত হলে। কেননা, আগে আমি ভাবতাম, তুমি যথেষ্ট আমানতদার। মানুষের কথাবার্তা আমানতদারীর সাথে লুকিয়ে রাখ। তুমি যখন উক্ত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করলে, তখন বুঝা গেল, তুমি আমানতদার নও। তোমার নিকট কথা ছেপে থাকে না। —(তাম্বীহুল গাফেলীন — নামীমা অধ্যায়)

ত্রয়োবিংশতিতম ক্ষতি—

গীবত দ্বারা অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করা হয়

গীবত করার অর্থ একজন মুসলমানের গোপন দোষ মানুষের সামনে প্রকাশ করা। অথচ কারো গোপন দোষত্রুটি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং তা মানুষকে অবহিত করা খুবই গোনাহের কাজ, কিন্তু বর্তমানকালে এ গোনাহ নিতান্ত ব্যাপক হয়ে পড়েছে, তাই মানুষের সাথে মেলামেশা খুবই কম করা উচিত।

ইমাম গাযালী (রঃ)-এর উপদেশ

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) হুকুকুল মোসলেম— মুসলমানের হক পর্বে বলেন—

وَاحْذَرْ صُحْبَةَ اَكْثَرِ النَّاسِ فَاِنَّهُمْ لَا يُقِيْلُوْنَ عَثْرَةً وَلَا يَغْفِرُوْنَ ذِلَّةً وَلَا يَسْتُرُوْنَ عَوْرَةً يُحَاسِبُوْنَ عَلَى النَّقِيْرِ وَالْقِطْمِيْرِ وَيَعْمِدُوْنَ عَلَى الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ

—এমন লোকদের সাহচর্য সঙ্গ গ্রহণ করো না যারা মানুষের ওজর অক্ষমতা গ্রহণ করে না, কোন অন্যায় দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে না, সামান্য ব্যাপারেও ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করে, সামান্য বিষয়েও জেদ করে, মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন করে না, সকলের নিকট অন্যের দোষ প্রকাশ করে দেয়। তবে যে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, তার গীবত করা বৈধ।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ফরমান

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, "لَيْسَ لِفَاجِرٍ حُرْمَةٌ —প্রকাশ্যে পাপাচারীর কোন সম্মান মর্যাদা নেই। তার গীবত দুরস্ত আছে।

—(এহইয়াউল উলূম—আলআযারুল মোরাখখাসা লিলগীবত)

ষষ্ঠ শাখা

গীবত পরিত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিত্যাগ এবং নিজের রসনাকে মানুষের গীবত হতে সংযত করে রাখার অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে এবং গীবত পরিহারকারী অনেক বড় বড় মর্যাদা লাভ করে।

প্রথম উপকারিতা—

মুসলমানের গোশত ভক্ষণ হতে আত্মরক্ষা

গীবত করা মুসলমানের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য। এ বিষয়ে পূর্বে সুদীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক ব্যক্তিকে খেলাল করার নির্দেশ দেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কিছুই খাইনি। তাই খেলাল কেন করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের দাঁতে সে লোকের গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যার গীবত করেছ। —(তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)-কে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জবাবে তিনি বলেন, একবার জুমআর দিন এক প্রতিবেশিনী আমার কাছে আসে এবং এক ব্যক্তির গীবত করতে শুরু করে। আমিও গীবতে শরীক হয়ে হাসতে থাকি। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন। চুপ হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা দুই জন গিয়ে বমি কর। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি বমি করলে আমার মুখ থেকে বেশ কিছু গোশত বেরিয়ে আসে। অনুরূপ দ্বিতীয় মেয়েলোকটিও বমি করে। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বমির সাথে গোশত বের হবার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এরশাদ করেন, এ হচ্ছে সে লোকের গোশত, তোমরা যার গীবত করেছ। —(তাফসীরে দোররে মনসূর)

যেনার গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা

গীবত যেনার চাইতেও বৃহৎ এবং নিকৃষ্টতর গোনাহ। গীবতকারী যেন যেনাই করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَلرِّبٰوا نَيِّفٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا اَهْوَنُهُنَّ بَابًا مِثْلُ مَنْ اَنْكَحَ اُمَّهٗ فِى الْاِسْلَامِ وَدِرْهَمُ الرِّبٰوا اَشَدُّ مِنْ خَمْسٍ وَّثَلٰثِيْنَ زَنْيَةً وَاَشَدُّ

الرِّبٰوا وَاَرْبَا الرِّبٰوا وَاَخْبَثُ الرِّبٰوا اِنْتِهَاكُ عِرْضِ الْمُسْلِمِ وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِهٖ

— সুদখোরীর সত্তরের বেশী স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সবচাইতে নিম্নস্তরের হল ইসলাম অবস্থায় মায়ের সাথে যেনা-করার মত। সুদের এক টাকা গ্রহণের গোনাহ পঁয়ত্রিশ যেনার চাইতেও বেশী। কিন্তু মুসলমানের সম্মান বিনষ্ট করার গোনাহ সুদের চাইতেও বেশী। —(বায়হাকী—শোআবুল ঈমান)

তৃতীয় উপকারিতা—
গীবত পরিহারে রোযা বিনষ্টি হতে রক্ষা পায়

গীবত রোযা নষ্ট করে দেয়। রমযান মাসে এক ব্যক্তি শিঙ্গা নিচ্ছিল আর শিঙ্গাদানকারীর সাথে মিলে অন্যের গীবত করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে এরশাদ করলেন— শিঙ্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের রোযা ভেঙ্গে গেছে। —(বায়হাকী)

চতুর্থ উপকারিতা— অযু মাকরূহ হওয়া থেকে রক্ষা

গীবতের কারণে অযু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই হানাফী মাযহাব অনুসারীদের মতে, অযুর পরে গীবত করলে অথবা মিথ্যা বললে পুনরায় অযু করে নেয়া উত্তম।

তাবেয়ী ইবরাহীম (রঃ)-এর অভিমত

তাবেয়ী ইবরাহীম (রঃ)-এর মতে, দুই কারণে পুনঃ অযু করতে হয়। (১) হদস অর্থাৎ পায়খানা প্রস্রাবের কারণে, (২) মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার কারণে।

অযুর পরে যেকোনভাবে কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে বুঝতে হবে, অযু নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং পুনরায় অযু করে নেয়া উচিত। —(বায়হাকী)

এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

দুই ব্যক্তি মসজিদের দরজায় উপবিষ্ট ছিল। সেখান দিয়ে এক নপুংসক যাচ্ছিল। উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় তার গীবত করে। এর পর তারা ফরয নামায আদায় করে এবং তাদের মনে গীবতের জন্য লজ্জা অনুতাপ আসে। তারা হযরত আতা (রঃ)-এর নিকট গিয়ে তাদের মনের অবস্থা বর্ণনা করে। তিনি বললেন, তোমরা পুনরায় অযু করে নামায পড়। আর রোযাদার হলে রোযা কাযা কর।— (এহইয়াউল উলূম—গীবত অধ্যায়)

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমত

হযরত আয়েশা (রাঃ) এরশাদ করেন—

اَلْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثٌ مِنْ فِيْكَ وَحَدَثٌ مِنْ نَوْمِكَ وَحَدَثُ الْفَمِ اَشَدُّ اَلْكِذْبُ وَالْغِيْبَةُ

—হদস (অপবিত্রতা) দুই প্রকার। মুখের অপবিত্রতা ও ঘুমের অপবিত্রতা। আর মুখের অপবিত্রতা হলে মিথ্যা বলা ও গীবত করা।

—(তাফসীরে দোররে মনসূর)

পঞ্চম উপকারিতা— হারাম থেকে আত্মরক্ষা

কোরআনের আয়াত এবং অনেক হাদীস দ্বারা গীবত হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরামের উক্তি থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَلْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اَنْ يَاْكُلَهُ وَيَغْتَابُ عَلَيْهِ بِالْغَيْبِ وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اَنْ يَخْرِقَهُ وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اَنْ يَلْطِمَهُ

— প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের গোশত হারাম, অনুপস্থিতিতে তার গীবত করা হারাম, তার মানহানি হারাম। আর কারো মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করা হারাম।

ষষ্ঠ উপকারিতা— রসনা জখম থেকে সুরক্ষিত থাকে

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) এরশাদ করেন—

لَاَنْ اَرْمِىْ رَجُلًا بِسَهْمٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَرْمِيَهٗ بِلِسَانِىْ لِاَنْ رَمْىُ اللِّسَانِ لَا يُخْطِىْ

— কাউকে রসনা দ্বারা আহত করার চাইতে তীর দ্বারা আহত করা আমার নিকট উত্তম। কেননা, তীর নিক্ষেপ করলে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গায়ে না লাগার

সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে মুখ থেকে কারো গীবত নিন্দাবাদ বের হয়ে গেলে সে ব্যক্তি নিশ্চিত আহত হয়।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—হেফযুল লেসান অধ্যায়)

সপ্তম উপকারিতা— লজ্জিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা

মানুষের গীবত থেকে যে নিজের রসনা নিবৃত্ত রাখে না, অবশেষে সে যথেষ্ট লজ্জিত হয়, কিন্তু এ লজ্জিত হওয়ার কোন উপকারিতা নেই। কেননা, মুখ থেকে কারো সম্পর্কে যে গীবত বের হয়ে গেছে, তা আর ফেরানো যায় না। এ কারণে পরহেযগারগণ নিজেদের রসনাকে নিরর্থক কথাবার্তা বাক্যালাপ হতে নিবৃত্ত রাখতেন। নিতান্ত জরুরী না হলে তাঁরা কোন কথা বলতেন না, যাতে লজ্জিত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেন এবং আখেরাতে তা তাঁদের আনন্দের কারণ হয়।

এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হজ্জের দিনসমূহে সাফা পাহাড়ের উপর লাব্বায়ক—তালবিয়া বলতেন আর নিজের নফসকে হিতোপদেশ দিতেন—হে নফস! তুমি মুখে ভাল কথা বলো, তা হলে সুখী হবে, মুখ থেকে কোন মন্দ কথা (গীবত গালি ইত্যাদি) বের করো না, যাতে লজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। —(এহইয়াউল উলূম—ফযীলাতুস সেমত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একবার পথিমধ্যে একটি শূকরের সাথে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাক্ষাত হয়। তিনি শূকরটিকে বললেন, ওহে! নিরাপদে চল। সফরসঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি শূকরকে উদ্দেশ করে এমন বাক্য উচ্চারণ করছেন! তিনি জবাব দিলেন—আমি কারো সম্পর্কে খারাপ কথা বলা পছন্দ করি না, সেটি শূকরই হোক না কেন। —(মোআত্তায়ে ইমাম মালেক—মা ইয়াতরাহু মিনাল কালাম অধ্যায়)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে লজ্জা এবং ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা কামনা করে, তার কর্তব্য হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে নীরবতা অবলম্বন করা।

—(এহইয়াউল উলূম—ফযীলাতুস সেমত অধ্যায়)

তৃতীয় ঘটনা

হযরত লোকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এক ব্যক্তির দাস ছিলেন। একদিন মনিব তাঁকে একটি বকরী জবাই করে সেটির উত্তম অংশ সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। তিনি বকরী জবাই করে সেটির জিভ এবং অন্তর মনিবের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় দিন মনিব বকরীর নিকৃষ্টতর অংশ সামনে হাযির করতে নির্দেশ দেন। আজও হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম পূর্বদিনকার মত উল্লিখিত দুই অংশই মনিবের সম্মুখে উপস্থিত করেন। মনিব জিজ্ঞেস করলেন, বকরীর উত্তম অংশ এবং নিকৃষ্ট অংশ হাযির করার নির্দেশে তুমি একই অংশ হাযির করলে, এর কারণ কি? হযরত লোকমান (আঃ) বললেন, যদি জিভ এবং অন্তর নিরাপদ থাকে তা হলে মানুষ নিরাপত্তা পায়। আর এ দুইটি অঙ্গ বিনষ্ট হলে মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই জিভ এবং অন্তর—এ দুই অঙ্গ যুগপৎ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টও বটে।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন— হেফযুল লেসান অধ্যায়)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে তিন বস্তুর অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা করবে, সে যেন সব অনিষ্ট থেকেই রক্ষা পেল। সে তিন বস্তু হচ্ছে— পেট, লজ্জাস্থান এবং রসনা।

কোন মানুষ পেটের অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা করলে হারাম রোজগার খাবে না। হারাম না খেলে সে উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হবে। কেউ লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করলে যেনা প্রভৃতি অপকর্মের ইচ্ছা পোষণ করবে না। তা হলে সে নিশ্চিত মুক্তি পাবে। আর কেউ রসনার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করলে মিথ্যা, নিরর্থক কথাবার্তা এবং গীবত, গালিগালাজ ইত্যাদি থেকে রক্ষিত থাকবে। —(এহইয়াউল উলূম—ফযীলাতুস সেমত অধ্যায়)

অষ্টম উপকারিতা—

গীবত থেকে আত্মরক্ষা করলে রসনা কবীরা গোনাহ থেকে মুক্তি পায়

হযরত ওকবা বিন আমের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ কাজ মুক্তিপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী করে? তিনি বললেন, তুমি নিজের রসনাকে নিবৃত্ত রাখ, তা থেকে কোন অনিষ্টকর বিষয় বের করো না এবং স্বগৃহে

অবস্থান কর আর আল্লাহ ছাড়া সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর এবাদতের প্রতি নিবিষ্ট হও, নিজের গোনাহের জন্য ক্রন্দন কর।

—(মেশকাতুল মাসাবীহ—মুসনাদে আহমদ হতে)

হযরত রবী বিন খায়সাম (রাঃ)-এর ঘটনা

হযরত রবী বিন খায়সাম (রাঃ) নিজের মুখ বন্ধ করে গৃহকোণে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিশ বছর পর্যন্ত তিনি দুনিয়াবী কোন কথা এবং মানুষের সাথে কোন কথা বলেননি। এমনকি যেদিন হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) শহীদ হন, সেদিন লোকেরা বলল, এ খবর পৌঁছালে হয়ত তিনি কিছু বলতে পারেন। লোকেরা এ দুঃসংবাদ তাঁকে পৌঁছালে তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন— اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ — হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, আপনি বান্দাদের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করবেন, যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করছে।

ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা শুনার পরও এতদ্ব্যতীত আর কোন কথাই তিনি বলেননি এবং নিজেকে এবাদতে নিয়োজিত রাখেন। —(তাম্বীহুল গাফেলীন— হেফযুল লেসান অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল। — (মেশকাতুল মাসাবীহ — দারেমী হতে)

হযরত তাউস (রঃ)-এর উপদেশ

হযরত তাউস (রঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমার রসনা হিংস্র জন্তু সদৃশ। হিংস্র জন্তুকে যতক্ষণ আবদ্ধ করে রাখা হয়, ততক্ষণ সেটির দ্বারা কারো ক্ষতি বা কষ্ট হয় না। কিন্তু স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে প্রত্যেকেরই জীবন নাশের সম্ভাবনা। অনুরূপ যতক্ষণ আমার রসনা নিবৃত্ত রাখি ততক্ষণ ভালই হয়। নতুবা তা আমাকে নিঃশেষ করে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারে।

—(এহইয়াউল উলূম—ফযীলাতুস সেমত অধ্যায়)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর উক্তি

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এক যুবকের উদ্দেশে বলেন— يَا شَبَابُ اِنْ وَقَيْتَ شَرَّ الشَّبَابِ اِنْ وَقَيْتَ سُوْءَ ثَلٰثٍ فَقَدْ وَقَيْتَ شَرَّ

تَقْلَقَكَ وَذَبْذَبَكَ وَقَبْقَبَكَ — হে যুবক। যদি তুমি মুখ, লজ্জাস্থান এবং পেটের অনিষ্ট থেকে বাঁচ, তা হলে যৌবনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। নতুবা যৌবন দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন— হেফযুল লেসান অধ্যায়)

নবম উপকারিতা— মৃতের গোশত ভক্ষণ থেকে আত্মরক্ষা

উপরে আলোচিত হয়েছে, গীবত করা মৃতের গোশত খাওয়ার মত।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত খচ্চরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। সেটিকে দেখে তিনি এরশাদ করেন— এ মৃত খচ্চরের গোশত পরিতৃপ্ত হয়ে ভক্ষণ করা মানুষের গীবত করার চাইতে উত্তম। — (ইবনে আবী শায়বার সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)

দশম উপকারিতা— কেয়ামতে দুঃখ অনুতাপ থেকে মুক্তি

যাদের গীবত করা হয়েছে, কেয়ামতের দিন তারা যখন গীবতকারীর আঁচল টেনে ধরবে, তখন সে খুবই দুঃখিত অনুতপ্ত হবে। ভয়ভীতি আর শংকার কারণে তার এক আজব অবস্থা হবে। দাবীদারদের যাবতীয় অপকর্মের বিপদ তার স্কন্ধে চাপবে। কারণ, সেদিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার প্রভাব পরাক্রমের প্রকাশ ঘটবে। এদিন আল্লাহ তাআলা এত ক্ষুব্ধ রাগান্বিত হবেন যে, প্রত্যেকেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এ ছাড়া বিপুল সংখ্যক লোকের দোষ-ত্রুটি উন্মোচিত হবে এবং মানুষের আমলনামা প্রচারিত হবে।

হযরত ইমাম আওযায়ী (রঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেককেই হিসাবের জন্য ডাকা হবে, তখন মানুষদেরকে বলা হবে— এ ব্যক্তির উপর যার যার অধিকার রয়েছে তারা এসে প্রাপ্ত অধিকারের বিনিময় নিয়ে যাও। তখন মানুষ বলবে, এ লোকের উপর আমাদের কোন দাবী নেই।

তখন আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দেবেন, অমুক দিন এ লোক তোমাকে গালি দিয়েছে, অমুক দিন তোমার গীবত করেছে, এ কথায় লোকেরা উল্লসিত হয়ে উঠবে এবং নিজেদের অধিকারপ্রাপ্তির ফরিয়াদ জানাবে।

—(তাফসীরে দোররে মনসূর)

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) সেফাতুল মাসায়েল অধ্যায়ে এরশাদ করেন—

فَهٰذَا اَمَّا يَرْجِىْ لِعَبْدٍ سَائِرٍ عَلَى النَّاسِ عُيُوْبُهُمْ وَاحْتَمَلَ فِىْ حَقِّ نَفْسِهِ تَقْصِيْرُهُمْ وَلَمْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ بِذِكْرِ مَسَاوِيْهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ فِىْ غِيْبَتِهِمْ بِهَا يَكْرَهُوْنَ لَوْ سَمِعُوْهُ

— কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার করুণা সে লোকের উপরই হবে যে মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছে, মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে, মানুষের গীবত করেনি। আর যে উল্লিখিত গোনাহগুলো করে, কেয়ামতের দিন তার কঠোর হিসাব লওয়া হবে এবং কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

একাদশতম উপকারিতা— রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি

অমুক লোক এ গোনাহ করেছে— কবর শরীফে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে এ খবর পৌঁছে, তখন তিনি দুঃখিত চিন্তিত হন। তাঁর নিকট কারো পুণ্য কর্মের সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। আর কারো গীবতের সংবাদে তাঁর মন একেবারেই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষের গীবত পরিহারের সংবাদে তিনি অত্যন্ত খুশী হন।

সপ্তম শাখা

গীবতের কারণ এবং তার প্রতিকার

মনে রাখা দরকার, মানুষ বেশ কিছু কারণবশতঃ গীবত করে থাকে। উক্ত কারণগুলো বিদ্যমান থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গীবত হয়ে যায়। সুতরাং গীবতের কারণগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা মানুষের কর্তব্য, তা হলে সে গীবত থেকে মুক্তি পাবে। নিম্নে গীবতের কারণসমূহ এবং প্রতিকার লিখিত হচ্ছে।

প্রথম কারণ ঃ

১. ক্রোধ

মানুষ কারণবশতঃ কারো উপর ক্রুদ্ধ হলে তার গীবত করে। এটা কয়েক প্রকার। যেমন—

পার্থিব বিষয়ে ক্রোধ— যখন মানুষ শুনতে পায়— অমুক ব্যক্তি আমাকে গালিগালাজ করে অথবা আমার গীবত করে, তখন তার মন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং শয়তানও তাকে উত্তেজিত করে। ফলে সেও গালিদাতার ও গীবতকারীর গীবত করতে শুরু করে। সে অনুসন্ধান করে দেখে না, উক্ত লোক আসলেই গালি দিয়েছে কিনা বা গীবত করেছে কিনা।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে নিজের রসনা প্রতিরোধ করে রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন এবং তাকে হেয় অপদস্থ করবেন না। আর যে নিজের ক্রোধ দমন করবে, ক্রোধ অনুযায়ী কাজ করবে না, আল্লাহ তাআলা তার থেকে আযাব প্রতিরোধ করে রাখবেন। যে আল্লাহর দরবারে গোনাহ মাফ চাইবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। —(বায়হাকী)

প্রথম কারণ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

গীবতের প্রথম কারণের কয়েকটি প্রতিকার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন—

প্রথম, গালি ও গীবতের সংবাদদাতাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। যে এ সংবাদ দিয়েছে সে চোগলখোর। সুতরাং তার সংবাদ অগ্রহণীয়।

ফকীহ আবুল লায়স (রঃ) বলেন, কেউ যদি তোমাকে বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ বলেছে। এরূপ অবস্থায় তোমার উপর ছয়টি বিষয় অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ এ চোগলখোরের কথা অন্য কারো নিকট বিবৃত করবে না। সে চোগলখোরী করেছে, এমন কথাও বলবে না, তা হলে এও গীবত হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাকে বলা হয়েছে— অমুক তোমাকে গালিগালাজ করে, ভালমন্দ বলে, তার দোষত্রুটি অন্বেষণে লেগে পড়বে না। কেননা, কোরআন করীমে অন্যের দোষ অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় বা মন্দ বলে বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। কেননা, কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ খুবই দূষণীয়। চতুর্থতঃ যে তোমাকে বলেছে, অমুক তোমাকে গালি দেয়, মন্দ বলে, সে চোগলখোর। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তার প্রতি মনে অসন্তুষ্টি পোষণ করবে। কেননা, চোগলখোরী একটা জঘন্য গোনাহ। আর গোনাহগারের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ ওয়াজিব। তার থেকে দূরত্ব অবলম্বন জরুরী। পঞ্চমতঃ যে গালি দেয়ার, মন্দ বলার কথা তোমার কাছে বলেছে, তাকে নিষেধ করবে যেন এরূপ না করে। ষষ্ঠতঃ উক্ত চোগলখোরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, চোগলখোর ফাসেক— পাপাচারী, তার সংবাদের কোন গুরুত্ব বা

নির্ভরযোগ্যতা নেই। এ সম্পর্কে নিম্নে একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

একদিন হযরত ইমাম যুহরী (রঃ) সোলায়মান বিন আবদুল মালেকের মজলিসে বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তথায় আগমন করে। সোলায়মান আগন্তুককে বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি তুমি আমার দুর্নাম করছ। আগন্তুক এ অভিযোগ অস্বীকার করে। তখন সোলায়মান বললেন, আমি নির্ভরযোগ্য লোক থেকে এ কথা শুনেছি।

সোলায়মানের কথায় হযরত ইমাম যুহরী (রঃ) বললেন, হে সোলায়মান! যে বলেছে, অমুক আপনার দুর্নাম করেছে, মন্দ বলেছে, সে চোগলখোর। আর চোগলখোর কখনোই বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য হয় না।

দ্বিতীয় প্রতিকার

যখন শুনতে পাবে কেউ তোমাকে মন্দ বলছে— তখন মনে করবে, আমার মাঝে কিছু মন্দ দোষত্রুটি রয়েছে। সুতরাং এরূপ ভেবে নিজেকে সকল দোষত্রুটি এবং গোনাহ থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করবে। আরও মনে করবে, লোকটি আমার সম্পর্কে যা বলেছে ঠিকই বলেছে। সুতরাং এ জন্য সে বিনিময় পাওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় প্রতিকার

কেউ কারো দুর্নাম বদনাম করলে ভাবতে হবে, যে আমার দুর্নাম করেছে, সে হয়ত কোনভাবে আমা দ্বারা কষ্ট পেয়েছে। সুতরাং এরূপ মনে করে তার প্রতি দয়া দেখাবে। তার উপকার করবে। তার সাথে দেখা সাক্ষাত করবে, খাতির তোয়াজ করবে। তা হলে তোমার প্রতি অসন্তুষ্টি মনোকষ্ট দূর হয়ে তার অন্তর শান্ত স্থিত হবে। পক্ষান্তরে, দুর্নাম বদনাম করেছে বলে তাকে কষ্ট দেবে না, গীবত করবে না, দুর্নাম রটাবে না।

চতুর্থ প্রতিকার

যদি কেউ তোমাকে মন্দ বলে, তা হলে মনে করবে, সে অহেতুক গোনাহ করেছে। আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মাফ করুন। আমিও যদি তার মত গীবত করি, তবে তার অনুরূপ শাস্তি পাব।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যখন জানতে পারতেন, অমুক লোক আমাকে মন্দ বলে, তা হলে তিনি সে লোকের প্রতি অত্যন্ত বিনয় নম্রতা প্রদর্শন করতেন, তার গীবত করতেন না। —(মুসনাদে ইমাম আযম)

২. যে সামনাসামনি গালি দেয় তার প্রতি ক্ষিপ্ত হওয়া এবং তার অনুপস্থিতিতে গীবত করা

কেউ সামনাসামনি গালি দিলে নিজের মনকে নিবৃত্ত রাখবে, তাকে ক্ষমা করে দেবে এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্বক সাহসিকতা বীরত্ব প্রদর্শন করবে।

প্রতিকার

একদা সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালি দেয়। তিনি চুপ থাকেন, লোকটি আবারও গালি দেয়। এবারও তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন। সে তৃতীয় বার গালি দিলে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও তাকে গালি দেবার ইচ্ছা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস ত্যাগ করতে উদ্যত হন। এ দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন? অথচ আমি বাড়াবাড়ি কিছুই করিনি। সে তিন বার গালি দেয়ার পর আমি তার জবাব দিতে ইচ্ছা করেছি মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি যতক্ষণ নীরব ছিলে, ততক্ষণ তোমার তরফ থেকে এক ফেরেশতা গালিদাতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছিল। যখন তুমি তার জবাব দেবার ইচ্ছা করলে, অমনি শয়তান মধ্যখানে লাফিয়ে পড়ে, এ কারণে আমি উঠে গেছি।

—(আবু দাউদ—আলবেররে ওয়াসসেলাহ পর্ব, আলইনতেসার অধ্যায়)

একদিন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) মিনায় মসজিদে খায়ফে বসা ছিলেন। এ সময় এক লোক এসে ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ করে বলল, ও হারামজাদা! আমি তোমাকে অমুক মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর তুমি হাসান বসরী (রঃ)-এর বিপরীত জবাব দিয়েছ। ইমাম সাহেব লোকটিকে বললেন, দেখ! হাসান বসরী (রঃ) তোমার জিজ্ঞাসিত মাসআলায় ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সঠিক অভিমত তাই, যা আমি বলেছি। সে ইমাম সাহেবকে আরও কয়েকটি গালি দেয়। উপস্থিত লোকজন গালিদাতাকে মারতে উদ্যত হলে ইমাম সাহেব তাদেরকে বাধা দেন। অতঃপর তিনি লোকটির উদ্দেশে বললেন, ওহে! তুমি যে আমাকে কাফের ইত্যাদি বলেছ, তা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা জানেন, আমি কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করিনি এবং আল্লাহ তাআলার সত্তা ব্যতীত অন্য কোন সত্তার প্রতি

কোন আশা পোষণ করিনি। তাঁর আযাব ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করিনি। আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির আলোচনা এসে গেলে ইমাম সাহেবের উপর ভীতি শংকা ছেয়ে যায়। তিনি অঝোর ধারে কেঁদে কেঁদে অশ্রু বহাতে থাকেন। এ অবস্থা দর্শনে গালিদাতা লোকটি নিজে নিজেই লজ্জিত হয় এবং ইমাম সাহেবের কাছ থেকে নিজের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি আমাকে যে গালি দিয়েছ তা-ও মাফ করেছি।

—(মুসনাদে ইমাম আযম— আবদুর রাজ্জাক বিন হুমামের সূত্রে)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

—সাহসিকতা বীরত্বের ভিত্তি কুস্তি লড়াইয়ের উপর নয়; বরং ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই প্রকৃত বীরত্ব।

—(মোআত্তায়ে ইমাম মালেক—গজব অধ্যায়)

হযরত আবু বকর ওয়াররাক (রঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের কাছ থেকে ছয়টি বিষয় কামনা করেছেন, সেগুলো পূরণ করা মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর কাম্য ছয়টি বিষয়ের দুইটি অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত— (১) আল্লাহর নির্দেশের সম্মান, (২) আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির সম্মান। দুইটি বিষয় রসনার সাথে সংশ্লিষ্ট— (১) আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ বা একত্বের স্বীকৃতি প্রদান, (২) সৃষ্টিকুলের সাথে বিনয় নম্রতা। আর দুইটি বিষয় সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট— (১) আল্লাহর নির্দেশের উপর ধৈর্য ধারণ, (২) সহিষ্ণুতা অবলম্বন।

—(তাযকেরাতুল আওলিয়া)

বিরোধিতার কারণে গীবত করা

যে কোন প্রকারে কষ্ট দিয়েছে, তার উপর ক্ষিপ্ত হওয়া, এ কারণে তার গীবত করা, জনসম্মুখে তার দোষ প্রকাশ করা, যেহেতু সে কষ্ট দিয়েছে, সেহেতু তাকেও কষ্ট দেব; এ মনোভাব বিরোধিতাজনিত কারণেই জন্মে থাকে। এরও যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

প্রতিকার

কেউ কাউকে কোন প্রকারে কষ্ট দিলে তার প্রতি মন ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ হয়। মন চায়, সে আমাকে এক প্রকারে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাকে শত প্রকারে

কষ্ট দেব, কিন্তু এ অবস্থায় কষ্টদাতাকে মাফ করে দেয়া, তার প্রতি অনুগ্রহ করা, সদাচার প্রদর্শন করা আবশ্যক। তা হলে কেয়ামতের দিন আমি তার পুণ্যের ভাগী হব। আর আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যদি তার গীবত করি তা হলে তার বদীসমূহ আমার আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সহীফাসমূহে লিখিত হিতোপদেশসমূহে এও আছে, আল্লাহ বলেন, হে বনী আদম! যে তোমার উপর জুলুম করে তাকে ক্ষমা কর, যে তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করে তার সাথে সদাচার কর, তা হলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং রহমত পাবে। —(রওযাতুল ওয়ায়েজীন)

দ্বিতীয় কারণ ঃ বংশ গৌরব

বংশ গৌরব প্রকাশেরও কয়েক ধরন প্রকার রয়েছে। যেমন— নিজের বংশকে উত্তম মনে করা, অন্যের বংশ সম্পর্কে গীবত করা, অন্য মানুষের বংশধারার অনিষ্ট অপকৃষ্টতা বর্ণনা করা। সুতরাং বংশ গৌরব প্রকাশহেতুও মানুষ গীবতে জড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, কোন মুসলামন অন্য মুসলমানকে তুচ্ছ অপদস্থ গণ্য করবে না। কেননা, অন্য মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন, তুচ্ছ গণ্য করা, অপদস্থ করা হারাম। —(এহইয়াউল উলূম— যম্মুল কেবর অধ্যায়)

প্রত্যেক মানুষেরই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। যদিও মধ্যখানে আল্লাহ তাআলা কারো বাপকে, দাদাকে ভাল বানিয়েছেন। সুতরাং বংশ বিচারে ভাল হলেও অন্যদের উপর আমাদের কোন সম্মান মর্যাদা নেই। কেননা, আমাদের সকলেরই মূল এক। আর পরিণতির বিচারে আমাদের উত্তম অনুত্তমের কথা ভাবা হলে তা একান্তভাবেই তাকওয়ার উপর ভিত্তিশীল। কারো বংশ গোত্র ভাল না হয়েও মোত্তাকী হলে সে সরল সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যে আল্লাহর এবাদতে ত্রুটি করে, সদ্বংশজাত অভিজাত বংশের হলেও পরকালে সে অনুশোচনা অনুতাপ করবে। সুতরাং বংশ গোত্রের কারণে কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা; তার গীবত করা নিতান্তই আহমকী কাজ।

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে লোকসকল! তোমাদের সকলেরই মাবুদ এক একক অংশীবিহীন

আল্লাহ তাআলা! সাবধান! অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের, কালোর উপর লালের, লালের উপর কালোর কোন মর্যাদা নেই। তবে হাঁ, যিনি মোত্তাকী তিনি অন্যদের উপর মর্যাদাবান। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ —তোমাদের মাঝে সে-ই বেশী মর্যাদাশীল, যে বেশী মোত্তাকী। —(তাফসীরে দোররে মনসূর)

রূপ সৌন্দর্যের অহংকার

নিজের রূপ সৌন্দর্য, গঠন আকৃতি ইত্যাদির জন্য অহংকার প্রকাশ করা এবং এ সব বিষয়ে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা— এ থেকেও অনেক সময় গীবতের স্পৃহা জাগে। নিম্নে এর প্রতিকার লিখিত হচ্ছে।

প্রথম প্রতিকার

রূপ সৌন্দর্যজনিত অহংকার মনে জাগ্রত হলে চিন্তা করবে, সব আকৃতিই মহান আল্লাহ বানিয়েছেন। কারো চেহারা সুন্দর এবং কারো গঠন আকৃতি অসুন্দর বানিয়েছেন। সুতরাং কারো চেহারা অসুন্দর হলেই সে নিন্দা ভর্ৎসনার পাত্র হতে পারে না। আর গঠন আকৃতি অসুন্দর হওয়ায় কোন ক্ষতিও নেই। বস্তুতঃ মানুষের ইহ-পরকালীন সাফল্য এবাদত, দুনিয়ার প্রতি অনাকর্ষণ, পরোপকার এবং মানব প্রেমের উপর নির্ভরশীল। তাই আল্লাহর কোন বান্দাকে মন্দ না ভাবা এবং মন্দ না বলা কর্তব্য। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি কাহিনী উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক জায়গায় দুর্গন্ধময় একটি কুকুর পড়ে ছিল। হযরত নূহ (আঃ) সে দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। কুকুরটি দেখে তাঁর খুবই ঘৃণা হয়। অবিলম্বে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ পাঠান, হে নূহ! কুকুরটিকে আমি এভাবেই বানিয়েছি। যদি এটি তোমার অপছন্দ হয় তা হলে এর চাইতে ভাল বানিয়ে লও। অথচ তুমি এর চেয়ে ভাল তো দূরে, এটির মত বানাতেও সক্ষম নও। সুতরাং কেন এটিকে মন্দ ভাবছ? এ হুকুম অবতীর্ণ হবার পর হযরত নূহ (আঃ) অঝোর ধারে কাঁদতে থাকেন। এ থেকেই তাঁর নাম নূহ — অধিক ক্রন্দনকারী হয়ে যায়।

—(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস—আদব অধ্যায়)

দ্বিতীয় প্রতিকার

প্রত্যেকেরই চিন্তা করা দরকার, কোন মানুষই ত্রুটিমুক্ত বা নিখুঁত নয়। এমনকি যে অন্যকে দোষমুক্ত মনে করে, সে নিজেও সব দোষ মুক্ত নয়।

সুতরাং যখন নিজের সত্তায়ই ত্রুটি বিদ্যামান, তখন অন্যের খুঁত প্রকাশ, দোষ বর্ণনা, নিজের রূপ সৌন্দর্যের গর্ব অহংকার নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সে ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের দোষ-ত্রুটি তাকে অন্যদের দোষত্রুটি থেকে নির্লিপ্ত রেখেছে। —(এহইয়াউল উলূম— এলেম অধ্যায়)

তৃতীয় প্রতিকার

চিন্তা করা দরকার, ভাল হওয়া সুন্দর আকৃতির উপর নয়; বরং ভাল হওয়া তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তাকওয়া ব্যতীত কারো উপর কারো কোন মর্যাদা নেই। —(তাবরানীর সূত্রে দোররে মনসূর)

সুতরাং কারো বাহ্যিক আকৃতির গীবত করা, নিজের আকৃতিকে ভাল মনে করা, অন্যের আকৃতিকে মন্দ অসুন্দর ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা, কারো আকৃতি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় সুন্দর হলেও মৃত্যুর পর তা মাটি খেয়ে ফেলবে এবং মাটিতে মিশে যাবে। এ সম্পর্কিত কিছু উপদেশমূলক ঘটনা এবং মনীষী বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একদিন জনৈক ফকীহ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ)-এর খেদমতে আগমন করেন। আগন্তুক এবাদতের আধিক্যের কারণে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর বিধ্বস্ত চেহারা দর্শনে তাজ্জব বনে যান। তিনি ফকীহকে বললেন, জনাব! আপনি তাজ্জব হচ্ছেন কেন? মৃত্যুর পরই কেবল মানুষের চেহারা তাজ্জবের বস্তু হয়। আমি যখন কবরে উপনীত হব, সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্টে পড়ব, তখন আপনি আমার চেহারা দেখলে ভীত হবেন। —(এহইয়াউল উলূম—যিয়ারাতিল কুবূর অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক হজ্জ কাফেলার সর্দার মোহাল্লাব বিন আবী সফর হযরত মোতাররেফ বিন আবদুল্লাহ (রঃ)-এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি দেখলেন, মোহাল্লাব উত্তম পোশাক পরে গর্বভরে চলছে। তখন হযরত মোতাররেফ (রঃ) বললেন, হে মোহাল্লাব! এরূপ গর্বভরে চলা আল্লাহর

অপছন্দ। মোহাল্লাব দম্ভভরে বলল, হে মোতাররেফ, তুমি আমাকে হিতোপদেশ প্রদান করছ! তুমি জান না আমি কে? আমি হজ্জ কাফেলার সর্দার। হযরত মোতাররেফ (রঃ) জবাব দিলেন, আমি তোমার সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানি। প্রথমে তুমি ছিলে নিষ্প্রাণ বীর্য। সে সময় এরূপ দম্ভ ভরে চলা এবং অহমিকা কোনটাই ছিল না। অবশেষে যখন কবরে যাবে তখন তোমার দেহ দুর্গন্ধযুক্ত হবে। তখন তোমার এ দম্ভ গর্ব কোন কাজেই আসবে না। আর জীবতকালেও তোমার মাঝে বর্জ্যে ভরপুর। তোমার অন্তর্জগত পচে আছে। সুতরাং তোমার শুরু, শেষ এবং মধ্যবর্তী অবস্থা সবই অনিষ্টপূর্ণ। তাই তোমার দম্ভ গর্ব প্রকাশ অশোভনীয়। আর পোশাক এবং বাহ্যিক আকৃতির সৌন্দর্যের জন্য গর্ব করা কোন ভাল কাজ নয়।

মোতাররেফ (রঃ)-এর উল্লিখিত রূপ উক্তিসমূহ শুনার পর মোহাল্লাব দম্ভ অহংকার পরিত্যাগ করে।

উপদেশবাণী

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, যে মানুষ প্রত্যহ এক দুই বার নিজের বর্জ্য নিজে পরিষ্কার করে, এতদসত্ত্বেও সে গর্ব অহংকার প্রকাশে বিস্মিত হতে হয়। —(এহইয়াউল উলূম— যম্মুল কেবর অধ্যায়)

চালচলন এবং বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য গর্ব

নিজের চালচলন, আচার আচরণ ও বুদ্ধি বিবেচনাকে উত্তম ভাবা এবং অন্যের চালচলন, আচর আচরণ ও বুদ্ধি বিবেচনাকে খারাপ ভাবাজনিত গর্ব অহংকারের কারণেও গীবত করা হয়। যেমন এরূপ বলা— অমুক উদ্ভ্রান্তের মত চলে, পাগলের মত থাকে, অমুক অত্যন্ত বোকা, অমুক একেবারেই অভদ্র, রুচিহীন।

আচার আচরণ সম্পর্কিত গীবতের প্রতিকার

মনে রাখা দরকার, পরিণতির অবস্থা কারোই জানা নেই। যাকে পাগল উদ্ভ্রান্ত ভাবা হচ্ছে, হয়ত আল্লাহর নিকট সে ভাল এবং নির্বিঘ্নে জান্নাতে চলে যাবে। কেননা, পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার ভিত্তি এবাদত নয়; বরং আল্লাহর করুণাই পরকালীন কল্যাণ আর সফলতার ভিত্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যারা প্রকাশ্যতঃ পাগল, উদ্ভ্রান্ত, তারাই জান্নাতের যোগ্য হয়। আর বহু লোক প্রকাশ্যতঃ খুবই উত্তম, কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। সুতরাং কারো চালচলন, আচার আচরণ এবং কাজকর্মের গীবত করা,

নিজের বুদ্ধি বিবেচনা, রুচিবোধের জন্য গর্ব অহংকার করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা, বাহ্যিক ভাল মন্দের কোন গুরুত্ব নেই। এ জগত নশ্বর– অস্থায়ী। পরকালীন মন্দই প্রকৃত মন্দ। যার গীবত করা হচ্ছে, তার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা নেই। এসব তাকদীর এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিষয়। বাহ্যিক দুর্ভাগা প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত হয়েছে, ওলীআল্লাহ এবং বিশিষ্ট বান্দাগণের অবস্থা প্রকাশ্যতঃ মন্দ এবং অসম্মানজনক মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর নিকট তাঁরা খুবই সম্মানিত।

নিম্নে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত কিছু ঘটনা এবং উপদেশবাণী উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক বছর মদীনায় অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষজন অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। একদিন মদীনাবাসী এস্তেস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামায পড়ার জন্য বের হন। বহির্গতদের মাঝে প্রখ্যাত বুযুর্গ আলেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রঃ)-ও ছিলেন। সবাই কান্নাকাটি করে দোআ করতে থাকেন, কিন্তু কারো দোআই কবুল হচ্ছে না। ইত্যবসরে এক কালো হাবশী আগমন করে। তার পরনে শুধু একখানা লুঙ্গি এবং কাঁধে একখানা চাদর রয়েছে। সে বলতে লাগল, ইয়া আল্লাহ, ইয়া এলাহী! আমরা গোনাহগার, গোনাহের কারণে আপনি আমাদের উপর পানি বন্ধ করে দিয়েছেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য আপনি এ মুহূর্তে পানি বর্ষাণ। পানি বন্ধ করে আমাদেরকে কষ্ট দেবেন না। হাবশী লোকটি এ দোআ করতেই অনতিবিলম্বে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে যায় এবং যথেষ্ট পানি বর্ষিত হয়।

—(এহইয়াউল উলূম—আদাবিদ দোআ অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত ওয়ায়স করনী (রঃ) যখন ওয়াজ নসীহত শুনতেন, তখন জান্নাতের আলোচনায় অত্যন্ত খুশী আর জাহান্নামের আলোচনায় খুবই ভীত হতেন এবং চীৎকার করে মজলিস ছেড়ে উঠে দৌড়াতেন। জাহান্নামের আলোচনা শুনার মত সহ্য শক্তি তাঁর অবশিষ্ট থাকত না। এ কারণে মানুষ তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করত। —(এহইয়াউল উলূম—আহওয়ালুল খায়েফীন অধ্যায়)

তৃতীয় কারণ ঃ এবাদতের আধিক্যহেতু অহংকার

নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার প্রকাশ করা, অধিক এবাদতের কারণে নিজেকে পূত পবিত্র পুণ্যশীল এবং মোত্তাকী বলে ভাবা, যারা এবাদত করে না, অথবা কম করে, তাদেরকে জাহান্নামী ভাবা, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের গীবত করা, যেমন— এরূপ বলা— অমুক লোক এবাদত করে না, খুবই খারাপ কাজ করে, অমুক লোক খুবই খারাপ, কেননা সে খুবই ঈর্ষাপরায়ণ, অমুক লোক বড় পাপাচারী, কেননা সে দাম্ভিক অহংকারী, অমুক লোক জাহান্নামের যোগ্য, কেননা খুবই গোনাহগার, অমুক লোক যদিও বিচারক কিন্তু খুবই জালেম— উল্লিখিত সবই গীবত এবং এসব গীবতের কারণ হল গর্ব অহংকার।

কেননা, অহংকারবশতই গীবতকারী নিজেকে সর্বপ্রকার দোষক্রটিমুক্ত পূত পবিত্র ভাবে। অন্যদের দোষ দেখে, নিজের দোষের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। বেশী এবাদত করার কারণে নিজেকে জান্নাতী মনে করে, এবাদত স্বল্পতার কারণে অন্যকে তুচ্ছ অপদস্থ জ্ঞান করে।

নিম্নে উল্লিখিত রূপ অহংকারজনিত গীবতের প্রতিকার উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম প্রতিকার

অধিক এবাদতে প্রবৃত্তির পবিত্রতা সাধিত হয় না। এবাদত আধিক্যের কারণে যদিও মানুষের মধ্যে বাহ্যিক ভাল দিকগুলো এসে যায়, কিন্তু এ অবস্থায়ও আভ্যন্তরীণ ভালটা প্রকাশিত হয় না। কেননা, হয়ত অন্তর ফেরানোর মালিক আল্লাহ তাআলা এবাদত থেকে তার মন ফিরিয়ে দেবেন। ফলে এ অধিক এবাদত তার জন্য ফলদায়ক হবে না। আর যে এবাদত কম করে, এবাদত স্বল্পতার কারণে তার খারাপ হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা, হয়ত এ লোকই মুক্তি পেয়ে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। কারণ, অনেক লোক সারা জীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকে আর মৃত্যুর সময়ে আদিকালে তার ভাগ্যে আল্লাহ নির্ধারিত হেদায়াত উথলে উঠে এবং সে তওবা করে পূত পবিত্র হয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপনীত হয়।

দ্বিতীয় প্রতিকার

কেউ বেশী এবাদত করলেও সে জন্য অহংকার না করা, অন্যকে জাহান্নামী মনে করে তার গীবত না করা, তাকে লজ্জিত না করা

অত্যাবশ্যক। মনে করবে, কেউই গোনাহমুক্ত নিষ্পাপ নয়। কেননা নিজেই যখন কখনো কখনো গোনাহে লিপ্ত হই, তখন অন্যের গীবত করা, অন্যকে ভর্ৎসনা উপহাস করা, মন্দ ভাবা, হেয় তুচ্ছ জ্ঞান করা অনুচিত।

নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এবাদত আধিক্য বা পুণ্যকর্ম প্রকৃতপক্ষে কারো মুক্তিপ্রাপ্তির ভিত্তি য়। প্রকৃতপক্ষে সুপরিণতিই মুক্তিপ্রাপ্তির ভিত্তি।

এক ফাসাদী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোক মৃত্যুবরণ করে। সে জীবদ্দশায় মানুষকে যে কষ্ট দিয়েছে, এ কষ্টের কারণে কেউই তার জানাযায় আসেনি। তার স্ত্রী মজুরি দিয়ে দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তার জানাযা ঈদগাহে নিয়ে যায়। কেউই তার জানাযার নামায না পড়ায় স্ত্রী তাকে দাফন করার উদ্দেশে জঙ্গলে নিয়ে যায়। জঙ্গলের নিকটেই ছিল এক পাহাড়। সেখানে এক যাহেদ (দুনিয়াবিরাগী) দরবেশ অবস্থান করতেন। তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে এ ফাসাদী ব্যক্তির জানাযা পড়ার ইচ্ছা করেন। এ খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শহরের সব লোকই জানাযার নামাযে একত্রিত হয়। নামায শেষে সবাই যাহেদ ব্যক্তির এ কাজে বিস্ময় প্রকাশ করে— এ মৃত ব্যক্তি অত্যন্ত ফাসাদী হওয়া সত্ত্বেও যাহেদ তার জানাযার নামায পড়লেন। তখন যাহেদ বললেন, আমার প্রতি এলহাম হয়েছে, এ যে মুর্দারটা আসছে; তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। তাই আমি তার জানাযার নামায পড়েছি। এ কথায় মানুষ আরো তাজ্জব বনে যায়। তারা বলাবলি করতে লাগল, এহেন ফাসাদী ব্যক্তি কি করে মাফ পেতে পারে! তখন যাহেদ মৃতের স্ত্রীর নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। স্ত্রী বলল, সে সব সময় মদ্য পান করত। সর্বপ্রকার গোনাহের কাজই সে করত। তবে তার মাঝে তিনটি উত্তম বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হচ্ছে, ভোরে তার অবচেতন অবস্থা দূর হওয়া মাত্রই সে গোসল করে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করত, সব সময় দুই একটি এতীমকে নিজের ঘরে রাখত এবং তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করত, মদের নেশা দূরীভূত হলেই সে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ত। সে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমি জানি না, জাহান্নামের কোণসমূহের কোন্ কোণে তুমি আমাকে নিক্ষেপ করবে? এ শুনে যাহেদ বললেন, এ তিন উত্তম বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে।

—(এহইয়াউল উলূম—কালামুল মোহতাযেরীন অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক পুণ্যবান যুবক স্বপ্নে দেখল, এক আবেদ জাহান্নামে এবং এক বাদশাহ্ জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পুণ্যবান যুবক স্বপ্নঘোরেই মানুষজনকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, যদিও আবেদ যথেষ্ট এবাদত করত, কিন্তু তার মাঝে একটা দোষ ছিল। তিনি রাজা বাদশাহদের সাথে খুব বেশী দেখা সাক্ষাত করতেন, দুনিয়ার প্রতিও কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন, এ দ্বিবিধ কারণেই তিনি জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়েছেন। পক্ষান্তরে বাদশাহ যদিও জালেম ছিল, কিন্তু তার আকীদা (ধর্ম বিশ্বাস) ছিল অত্যন্ত ভাল। পরন্তু সে দরবেশ শ্রেণীর লোকদের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা রাখত। তার এ দ্বিবিধ উত্তম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলার খুবই পছন্দ হয়। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাকে মাফ করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন। —(শেখ সাদী—বোস্তাঁ)

সারকথা, নাজাত প্রকাশ্য এবাদতের উপর ভিত্তিশীল নয়। কেননা, কখনও ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা হয়ে যায়। যদি কেউ সর্বদা হাতে তসবীহ্ রাখে এবং কাপড়ে তালি লাগিয়ে পরিধান করে, তবুও তার জান্নাতী হওয়া অজ্ঞাত। অবশ্য যদি সে সব বদ আমল থেকে এবং যথাসাধ্য সকল সগীরা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তা হলে সে জান্নাতের যোগ্য সাব্যস্ত হয়। অনুরূপ কেউ সদা সর্বদা গোনাহ্ করলেও তার বদকার হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা হয়ত তার কোন নগণ্য এবাদত পছন্দ হওয়ায় তাকে মাফ করে দেবেন। তাই এবাদতের কারণে নিজেকে উত্তম আর অন্যদেরকে মন্দ ভাবা, তাদের গীবত করা খুবই মন্দ কথা।

দ্বিতীয় প্রতিকার

কেউ এবাদত করলেও এ জন্য গর্ব অহংকার লালন না করা, আনন্দিত আহ্লাদিত না হওয়া এবং এবাদত না করার কারণে অন্যদেরকে জাহান্নামী মনে করে তাদের গীবত না করা, তাদেরকে হেয়, লজ্জিত অপমানিত না করা আবশ্যক। চিন্তা করবে, কোন মানুষই গোনাহ থেকে মুক্ত নয়। কেউই নিষ্পাপ নয়। সুতরাং প্রত্যেকেই যখন কখনও কখনও গোনাহ্ করে বসে, তখন এ জন্য অন্যকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করা কেন, আর তাকে মন্দ অপকৃষ্ট ভাবাই বা কেন?

ওমর বিন যার (রঃ)-এর এক ফাসেক পাপাচারী প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করলে অধিকাংশ লোক তাকে হেয় অপদস্থ মনে করতে থাকে এবং অত্যধিক গোনাহ করার কারণে তার জানাযার নামায আদায় হতে বিরত থাকে, কিন্তু ইবনে যার (রঃ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং কাফন

দাফনও করেন। দাফন কার্য থেকে অবসর হয়ে হযরত ইবনে যার (রঃ) তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতকে সম্বোধন করে বললেন; আমি জানি, তুমি তোমার সমগ্র জীবন ইসলামের উপর অতিবাহিত করেছ, জীবদ্দশায় নামাযও পড়েছ। সুতরাং এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যদিও মানুষ বলছে— অমুক খুবই পাপাচারী গোনাহগার ছিল, কিন্তু আমি বলি, কে গোনাহগার নয়!

—(এহইয়াউল উলূম—কালামুল মোহতাযেরীন অধ্যায়)

চতুর্থ কারণ— সতীর্থদের অনুগমন

যখন মানুষ দেখতে পায়, দুই চার জন সমবয়স্ক, সতীর্থ বন্ধু-বান্ধব বসে জাগতিক কোন বিষয়ে আলোচনা করছে, মানুষের গীবত নিন্দাবাদ করে মানসিক আনন্দ উপভোগ করছে, তখন তারও মন চায়, আমি অত্র মজলিসে যাই এবং দুই চারটা কিস্‌সা কাহিনী শুনাই। এমতাবস্থায় যে শয়তানের অনুগামী হয়, শুধু এ খেয়াল করা মাত্রই শয়তান তাকে উক্ত মজলিসে নিয়ে যায় এবং তাকে দিয়ে অন্যের গীবত নিন্দাবাদ করায়। আর যে দ্বীনের দিক থেকে কিছুটা অপূর্ণ হয়, শয়তান তার প্রবৃত্তির সাথে লড়াই জুড়ে দেয়। তার অন্তরে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করে। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলে ফেরেশতা বলে, মানুষ থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে ঘরের কোণে অবস্থান করা উত্তম। তখন শয়তান তার কানে কানে বলে, নিজের জীবনের উপর কেন এ ধরনের কষ্ট কঠোরতা আরোপ করছ? তোমার সতীর্থ, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কেউ এমনটা করে না। শয়তানের এহেন ফিসফিসানির জবাবে ফেরেশতা তাকে শিখিয়ে দেয়— মানুষের সংসর্গ এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের সমাবেশে গমন একেবারেই ক্ষতিকর। আখেরাতের জন্য সর্বপ্রকারে অনিষ্টকর। তুমি যদি মুহূর্তকালের জন্য নিজেকে মানুষের সংসর্গ এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের সমাবেশে গমন হতে ফিরিয়ে রাখ, তা হলে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ হতে বাঁচিয়ে রাখলে। গীবত হচ্ছে— এমন মজলিসে গমন না করলে আখেরাতের জীবনে তুমি অবশ্যই এর মজা ভোগ করবে। এ সময় যদি তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং বন্ধু বান্ধবের অনুসরণ অনুগমন কর, তা হলে কেয়ামতে এর শাস্তি ভোগ করবে।

সুতরাং এ ব্যক্তি যদি হুশিয়ার, এবাদতগোজার এবং পুণ্যকর্মশীল হয়, তা হলে সে শয়তানের ফুসলানির উপর ফেরেশতার কথাকে প্রাধান্য দেয়। গীবত চর্চার মজলিসে গমন করে না। আর যদি সে গোনাহে জড়িত থাকে, শয়তানের অনুগত হয়, তা হলে তার প্রবৃত্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা, ফুসলানি মেনে নেয়। সে ভাল কথাকে মন্দ ভাবতে শুরু করে। কেননা, শয়তান

হচ্ছে কুকুরের মত। খাদ্য খাবার নেই— এমন জায়গায় কুকুর আসলে একবার তাড়ালেই ভেগে যায়। আর কোথাও যদি খাদ্য খাবার থাকে, তা হলে একবার তাড়ালেই কুকুর তথা হতে ভেগে যায় না; বরং কয়েক বার তাড়ালে তবেই ভাগে। অনুরূপ যে প্রবৃত্তি গোনাহ হতে মুক্ত পবিত্র, তা ফেরেশতার এক দুই বার বলাতেই শয়তান তার থেকে পলায়ন করে। আর যদি গোনাহগার হয়, তা হলে শয়তান তার উপর প্রবল হয়। প্রবলতা লাভ করতে সক্ষম হলে শয়তান মানুষকে খুবই কষ্ট দেয়। এ অবস্থায় সে পলায়ন করলেও যথেষ্ট কষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

প্রতিকার

কেউ যখন দেখতে পাবে, তার বন্ধু বান্ধব মজলিস জমিয়ে বসেছে, মানুষের গীবত নিন্দাবাদ করছে, তার মনেও চায় সে মজলিসে যেতে, তখন ভাববে, বন্ধু বান্ধব, সতীর্থদের অনুসরণ অনুগমনে কোন ফায়দা নেই; বরং এতে আখেরাতের অনিষ্ট নিহিত রয়েছে। যদি এরূপ ধারণা হয়, যদি আমি বন্ধু বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবাদতে রত হই, তা হলে তাদের কেউ আমাকে অহংকারী, কেউ উদ্ভ্রান্ত পাগল, কেউ বেওকুফ নির্বোধ বলবে; সুতরাং আমারও বন্ধু বান্ধবের মজলিসে অংশগ্রহণ করাই শ্রেয়। তা হলে বন্ধু বান্ধবের উল্লিখিত রূপ অপমানকর উক্তি হতে রক্ষা পাব। তখন এ বলে মনকে বুঝাবে— বন্ধু বান্ধবদের ভর্ৎসনা, তিরস্কার, অপমানকর উক্তি তো সামান্য সময়ের জন্য মাত্র। এর বিনিময়ে আখেরাতে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। সুতরাং এখন সামান্য সময়ের জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে প্রতিরুদ্ধ করে রাখা কর্তব্য, তা হলে হাশরের ময়দানে এর সওয়াব লাভ করব। সামান্য সময়ের আনন্দ খুশীর জন্য সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে লালনকারীদের সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন—

স্বপ্রবৃত্তিকে আরাম আয়েশে লালনকারী নিত্যদিন নিজের শত্রুকেই শক্তিশালী বানায়। জনৈক ব্যক্তি একটি নেকড়ের বাচ্চা পালন করেছিল। বড় হয়ে সেটি তার মালিককেই চিরে ফেলে।

অতএব, ভাবার বিষয়, চিকিৎসক যখন রোগীকে বলে, তিন দিন পর্যন্ত খাদ্য খাবার গ্রহণ না করলে তুমি এ রোগ থেকে মুক্তি পাবে, নয়তো তোমার রোগ আরও কঠিন হয়ে পড়বে। অবশেষে আফসোস অনুশোচনা করবে। শুধু ডাক্তারের উপর একবার বিশ্বাস করেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তিন দিন অভুক্ত থাকতে প্রস্তুত হয়ে যায়। যাতে খুব শিগগির সে সুস্থতা লাভ

করতে পারে। অথচ চিকিৎসকের কথা সত্য হওয়া এবং বাস্তবেও তার কথিত রূপ হওয়া নিশ্চিত বিষয় নয়। এতদসত্ত্বেও তাড়াতাড়ি রোগমুক্তির আশায় রোগী চিকিৎসকের কথা মেনে নেয়। যেক্ষেত্রে একজন জাগতিক রোগের চিকিৎসকের উক্তির এরূপ মর্যাদা দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে পাপীতাপীদের আত্মিক রোগের সত্য চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কিভাবে গুরুত্বহীন বিবেচিত হতে পারে! তিনি এরশাদ করেছেন— যে মানুষের দোষ বর্ণনা থেকে নিজের রসনাকে বিরত রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষসমূহ গোপন রাখবেন। সর্বসাধারণ্যে জনসমাবেশে তাকে লজ্জিত অপমানিত করবেন না। সুতরাং সামান্য সময় বন্ধু-বান্ধব সতীর্থদের অনুসরণ করে বিনিময়ে পরকালের বিপদ খরিদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ কারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সতীর্থ বন্ধু-বান্ধবদের কথা মেনে নিতেন না।

পঞ্চম কারণ— বদকার আলেমদের অনুসরণ

গীবতের পঞ্চম কারণ হল বদকার আলেমদের অনুসরণ। সর্বসাধারণ মানুষ যখন দেখতে পায়, আলেমগণ অন্যের গীবত করতে কোন রকম চিন্তা ভাবনা করে না, নির্বাধে নির্ভয়ে অন্যের গীবত করে, তখন সর্বসাধারণ মানুষও গীবতে শরীক হয়। যদি কেউ তাদেরকে বলে– গীবত করো না। তখন তারা ঝটপট জবাব দিয়ে বসে, অমুক আলেম, অমুক বুযুর্গ নির্ভয়ে নির্বাধে এ ধরনের লোকদের গীবত করে থাকেন। সুতরাং আমাদের ভয় কিসের। যদি এটা নিষিদ্ধই হত তা হলে আলেমরা এর শরণাপন্ন হবেন কেন? নিম্নে আলেমদের অনুসরণে গীবতে জড়ানোর প্রতিকার প্রতিবিধান সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছে।

প্রথম প্রতিকার

যেসব আলেম মানুষের গীবত করে বেড়ায়, এ থেকে তওবা করে না, তাদের ব্যাপারে বুঝতে হবে, প্রকৃত অর্থে এরা আলেম পদবাচ্যই নয়। শুধু কিতাব পড়লেই এলেম অর্জিত হয় না, আলেম হওয়া যায় না। এলেম অনুযায়ী আমল করা হলে তবেই কোন মানুষ আলেম বুযুর্গ বলে কথিত হবার যোগ্য সাব্যস্ত হন। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন— যত এলেমই হাসিল কর, তদনুযায়ী আমল না হলে তুমি বেওকুফ নির্বোধই রয়ে গেলে। কোন চতুষ্পদ জীবের উপর কিছু কিতাব চাপিয়ে দিলেই সে কোন অভিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষে পরিণত হয় না।

তাই কোন আলেম ব্যক্তিকে অন্যের গীবত করতে দেখলে সর্বসাধারণ মানুষের উচিত তাকে আলেম নয় বরং জাহেল মনে করা, কোনভাবেই এমন আলেমনামা ব্যক্তির অনুসরণ অনুকরণ না করা। কেননা, মোমেনদেরকে কষ্টদানকারী আলেম মধুবিহীন মাছির মত। যে মাছি মানুষকে শুধু কষ্টই দেয়, তা দ্বারা কোন প্রকার উপকার হয় না।

দ্বিতীয় প্রতিকার

যে আলেম এলেম অনুযায়ী আমল করে না, যেমন— সদা সর্বদা মানুষের গীবত করে, সে আল্লাহ তাআলার ক্রোধের পাত্র। কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সে তিরস্কৃত হবে এবং অত্যন্ত ধমক ও ভয়ভীতির সম্মুখীন হবে। অতএব, বেআমল আলেমদের নিন্দায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম এবং মহামনীষীদের অনেক বাণী উদ্ধৃত রয়েছে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন—

وَيْلٌ لِمَنْ لَهُ يَعْلَمُ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

—এলেমহীন ব্যক্তির প্রতি একবার আর বেআমল আলেমের প্রতি সাত বার লানত। —(এহইয়াউল উলূম— আফাতুল এলম অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ

—কেয়ামতের দিন সে লোকের কঠিন শাস্তি হবে, যে নিজের এলেম দ্বারা উপকৃত হয়নি। অর্থাৎ এলেম অনুযায়ী আমল করেনি।

—(বায়হাকী হতে কাশফুল গোম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ وَيَنْسٰى نَفْسَهُ مِثْلُ الْفَتِيْلَةِ تُضِيْئُ عَلَى النَّاسِ وَتَحْرِقُ نَفْسَهُ

—বেআমল আলেম— যে নিজের কথা ভুলে গিয়ে অন্যকে উপদেশ প্রদান করে, তার উদাহরণ হচ্ছে সে মশালের ন্যায়, যার কারণে মানুষ আলো পায়, আর তা নিজে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

—(বাযযার হতে আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এরশাদ করেন—

مَثَلُ الَّذِىْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَلَا يَعْمَلُ بِهٖ كَمَثَلِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فِى السِّرِّ فَحَمَلَتْ فَظَهَرَ حَمْلُهَا فَافْتَضَحَتْ۔

— যে আলেম এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে সে রমণীর, যে চুপিসারে যেনা ব্যভিচার করে। আর যখন মানুষের নিকট তার অপগর্ভের কথা প্রকাশ পায়, তখন সে কেমন লজ্জিত অপদস্থ হয়!

বেআমল আলেমও চুপিসারে ব্যভিচারিণী রমনীর মত প্রকাশ্যতঃ খুবই পরহেযগার মোত্তাকী, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সে আলেম নয়। কেয়ামতের দিন সে খুবই লজ্জিত হবে।

—(এহ্ইয়াউল উলূম— আফাতুল এলম অধ্যায়)

জনৈক ব্যক্তি এক মাসআলা সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-কে বলল, বর্তমানকালের ফকীহগণ এ মাসআলায় এরূপ ফতোয়া দিয়ে থাকেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) লোকটির কথায় রুষ্ট হয়ে বললেন, বর্তমানে কোন ফকীহ নেই। কেননা, প্রকৃত ফকীহ তিনি, যিনি দুনিয়াবিমুখ, আখেরাত আকাঙ্ক্ষী এবং সর্বদা আল্লাহর এবাদতে নিরত থাকেন। বর্তমানকালে এমন কেউ নেই।

—(তাম্বীহুল গাফেলীন—আল-আমালু বিলএলম অধ্যায়)

হযরত মালেক বিন দীনার (রঃ) বলেন—

اِذَا لَمْ يَعْمَلِ الْعَالِمُ بِعِلْمِهٖ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهٗ مِنَ الْقُلُوْبِ

— যে আলেম এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তার হিতোপদেশ মানুষের অন্তরে স্থায়ী হয় না। —(এহইয়াউল উলূম—আফাতুল এলম অধ্যায়)

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোআয রাযী (রঃ)-এর সূত্রে তাযকেরাতুল আওলিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে— তিন ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন করবে না। তারা হল— জাহেল সুফী, রিয়াকার তেলাওয়াতকারী, উদাসীন আলেম। অর্থাৎ যে নিজের এলেম অনুযায়ী আমল করে না।

বর্তমান কালের সর্বসাধারণ মানুষের অবস্থা হচ্ছে— তারা মসজিদে বসে দুনিয়াবী আলোচনা এবং অন্যের দোষত্রুটি বর্ণনাপূর্বক হাসাহাসি করতে থাকলে কেউ যদি এ থেকে তাদেরকে বিরত হতে বলে, তখন তারা বলে, আলেমরাও তো এমন করে থাকেন; সুতরাং আমরা কেন করব না, এতে

আমাদের দোষটাই বা কি? তাদের এরূপ উক্তি যে কঠোর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এও তারা বুঝে না। কেননা, কেউ স্বইচ্ছায় জাহান্নামে যেতে থাকলে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তার সাথে জাহান্নামে যাবে না।

তৃতীয় প্রতিকার

কোন বেআমল আলেমের কর্মকাণ্ডের প্রতি দেখবে না; বরং তার হিতোপদেশ এবং সদুক্তিসমূহের প্রতি দেখবে। কেননা, কোন বেআমল আলেমকেও যদি গীবত দুরস্ত কিনা কেউ জিজ্ঞেস করে? তা হলে সে অবশ্যই জবাব দেবে, গীবত অকাট্য হারাম। তাই হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। তিনি এরশাদ করেন— أُنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ —কি বলছে তা দেখ, বক্তার প্রতি দেখো না।

ষষ্ঠ কারণ— ঈর্ষা

গীবতের ষষ্ঠ কারণ ঈর্ষা। কেননা, মানুষ যখন অন্তরে কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে, তখন সে সদা সর্বদা ঈর্ষিত ব্যক্তির গীবত করেই সময় অতিবাহিত করে।

ঈর্ষার প্রতিকার

অন্তরে কারো প্রতি ঈর্ষার সৃষ্টি হলে তা বের করে ফেলা আবশ্যক। সাথে সাথে নিজের রসনাকেও প্রতিরোধ করে রাখবে। ঈর্ষাবশতঃ অন্যের গীবত করে, দোষত্রুটি চর্চা করে নিজের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করবে না। সাথে সাথে এও মনে করবে, অন্যের প্রতি ঈর্ষা পোষণ কবীরা গোনাহ। সুতরাং এ থেকে অন্তর পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। যদি কারো প্রতি মন প্রসন্ন না হয় তা হলে যথাসাধ্য তার গীবত ও নিন্দাচর্চা থেকে নিজের রসনা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। যাতে অন্ততঃ রসনা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, কারো দ্বারা এক গোনাহ অনুষ্ঠিত হলে এ পন্থা দ্বিতীয় গোনাহে জড়ানো থেকে উত্তম।

সপ্তম কারণ—আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের প্রতি আস্থা

গীবতকারীকে কেউ এ গর্হিত অপকর্ম থেকে নিষেধ করলে সে বলে, আল্লাহ তাআলা গাফূরুর রাহীম– অতিশয় দয়ালু, ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিয়ে দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তাআলার দয়া অনুগ্রহ এবং ক্ষমা গুণের প্রতি অতি আস্থাশীল হয়েও অনেকে গীবতের মত জঘন্য গোনাহে জড়িয়ে পড়ে।

প্রথম প্রতিকার

এ কথা বুঝা দরকার, আল্লাহ্ তাআলা গাফূরুর রাহীম– অতিশয় দয়ালু, ক্ষমাশীল, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি যে জাব্বার কাহ্হার—অতিশয় প্রতাপশালী, শক্তি ক্ষমতাধিকারী; সুতরাং তিনি যে তাঁর দয়া এবং ক্ষমাশীলতার গুণে শুধু আমাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহই করবেন, তাঁর প্রতাপ এবং নিরংকুশ শক্তি ক্ষমতা গুণ আমাদের উপর প্রয়োগ করবেন না, এর কি নিশ্চয়তা রয়েছে। নিতান্ত তুচ্ছ কোন গোনাহের কারণেও যদি তিনি আমাদেরকে পাকড়াও করেন, তা হলে আমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। পক্ষান্তরে গীবত গোনাহে কবীরা। এর জন্য আল্লাহ্ তাআলা কোন শাস্তিই দেবেন না—এটা কোন নিশ্চিত বিষয় নয়। যদি আল্লাহ্ তাআলা শাস্তি দেন তা হলে আমাদের কি অবস্থা হবে? এ ভয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম কেমন ভীত থাকতেন? নিজেদের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি এবং পদস্খলনের জন্য কেমন কান্নাকাটি করতেন? অথচ তাঁদের জাহান্নামী হতে হবে না—এ ব্যাপারে তাঁরা আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের বর্ণিত অবস্থা। অথচ আমরা আপাদমস্তক গোনাহে ডুবে আছি, আমাদের কি অবস্থা হবে? একদিন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর ভয়ভীতি ছেয়ে যায়, তিনি কান্নাকাটি আহাজারি করতে করতে পাহাড় জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে যান।

—(এহইয়াউল উলূম— আলআম্বিয়াউল খায়েফীন অধ্যায়)

দ্বিতীয় প্রতিকার

গীবত করার সময় এও ভাববে, আল্লাহ্ তাআলা আপন সত্তায় অতিশয় দয়ালু এবং ক্ষমাশীল বটে, কিন্তু গীবতের গোনাহ মাফ করা না করা বান্দার হক। এ ব্যাপারে বান্দা স্বাধীন। কেয়ামতের দিন যদি কেউ কারো থেকে গীবতের হকপ্রাপ্তির ফরিয়াদ জানায়, তা হলে আল্লাহ্ তাআলা নিজের ইনসাফ আর ন্যায়বিচার গুণে ফরিয়াদী বান্দাকে সন্তুষ্ট করবেন।

অষ্টম কারণ— ক্রোধ

গীবতের আরেক কারণ ক্রোধ। কারো প্রতি মনে ক্রোধের সৃষ্টি হলে মানুষ সব সময় সর্বপ্রকারে তার দুর্নাম রটায়। তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ অনুযোগ এবং গীবত করে।

প্রতিকার

কারো থেকে কোন প্রকারে কষ্ট পেলে তার প্রতি ক্রোধ না রাখা, তার গীবত না করা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ না করা মানুষের অবশ্য

কর্তব্য। যদিও এরূপ স্থলে শয়তান মানুষকে অত্যন্ত কুমন্ত্রণা দেয় এবং সর্বপ্রকার অনিষ্ট সৃষ্টি করে।

এক যাহেদ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি মানুষের সাথে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করব? তিনি জবাবে বললেন, বরং তুমি মানুষের সাথে মেলামেশা কর, তাদের প্রদত্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য কর। — (নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস)

নবম কারণ—হাসিঠাট্টা করা

মানুষের সাথে হাসিঠাট্টা করাও গীবতের অন্যতম কারণ।

প্রতিকার

হাসিঠাট্টাজনিত কারণে যে মানুষের গীবত করে, তার জানা আবশ্যক, দুনিয়ায় যে অন্যকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, কেয়ামতে সে হাসিঠাট্টার পাত্র হবে। মানুষকে হাসানোর জন্য যদি কেউ দুনিয়ায় অন্যকে ঠাট্টা মস্করা করে, তা হলে আজকে যাকে ঠাট্টা মস্করা করা হচ্ছে, কেয়ামতের দিন সাধারণ সমাবেশে তাকে ঠাট্টা মস্করা করা হবে।

দশম কারণ—মন্দ ধারণা পোষণ

কেউ কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলে তার গীবত করে, তার সম্পর্কে অভিযোগ অনুযোগ করে এবং তার দোষক্রটি বর্ণনা করে।

প্রতিকার

জেনে রাখা আবশ্যক, কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ এবং তার গীবত করা নিষিদ্ধ। অকারণে কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ একেবারেই নির্বুদ্ধিতা এবং আহমকীর পরিচায়ক। কেননা, প্রকৃত ব্যাপার অজ্ঞাত। যে বিষয়ে আমরা মন্দ ধারণা পোষণ করে চলেছি, হয়ত তা সে মুসলমানের মাঝে নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَلظَّنُّ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ

—পোষিত ধারণা কখনও সত্য এবং কখনও বিভ্রান্তিকর হয়। সুতরাং নিছক ধারণার উপর নির্ভর করা অনুচিত। —(তাফসীর দোররে মনসূর)

যদি কেউ কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করে, যে কারণে উক্ত মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তা হলে ভাবা উচিত, এ দোষ বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা সম্পর্কে কিরূপে জানা গেল? কেননা, এ বর্ণনাকারীর

উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। সে হয়ত মিথ্যা বলছে। উপরন্তু যে কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করে সে গীবত করেছে। আর গীবতকারী ফাসেক—পাপাসক্ত। সুতরাং ফাসেক পাপাচারীর কথার কোন গুরুত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নেই।

যদি স্বয়ং কাউকে কোন পাপাচারে লিপ্ত দেখে তার প্রতি মন্দ ধারণা জন্ম নেয়; যেমন—কেউ কাউকে যেনারত দেখে তার প্রতি মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তার প্রতি মনে জন্ম নেয়া মন্দ ধারণা প্রতিরোধের পন্থা হল, মনে করবে, হয়ত সে এ থেকে তওবা করেছে। একবার শয়তান তার উপর বিজয়ী হয়েছে, আরেক বার সে শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছে।

কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টির আরেক কারণ হচ্ছে তার মুখনিঃসৃত কথা। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট মন্দ ধারণা প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে, মনে করবে, এ মুসলমান কথিত বাক্যের মর্ম হয়ত অন্য কিছু হবে। কেননা, কারো কোন কথার নির্দোষ মর্ম গ্রহণ করা গেলে সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিপূর্ণ মর্ম গ্রহণ একেবারেই ভুল।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

لَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ اَخِيْكَ سُوْءً وَاَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِى الْخَيْرِ مُحْتَمَلاً۔

–যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ভাইয়ের মুখনিঃসৃত কোন কথার ভাল মর্ম গ্রহণ সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথার খারাপ অর্থ গ্রহণ অনুচিত।

— (তাফসীর দোররে মনসূর— আহমদ ইবনে হাম্বলের সূত্রে)

একাদশতম কারণ—

শাসক শ্রেণীর নিকট নিজের সম্মান মর্যাদা বাড়ানো

অন্যের গীবত দুর্নাম করে শাসককে তার প্রতি ক্ষিপ্ত অসন্তুষ্ট করা, যাতে দরবার গরম এবং শাসক অন্যের প্রতি রুষ্ট হয়— এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল, শাসকের নিকট নিজের সম্মান মর্যাদা বাড়ানো।

প্রতিকার

মনে করা দরকার, শাসক অথবা কোন ধনাঢ্য প্রভাবশালী ব্যক্তির গীবত করার ফলে গীবতকৃত ব্যক্তি অপদস্থ অপমানিত হয়েছে এবং নিজের সম্মান মর্যাদা বেড়েছে, কিন্তু এতে কোন উপকার নেই। কেননা, এ মান সম্মান ইহজাগতিক বিষয়। আর এ জগত একদিন বিলীন হয়ে যাবে। জাগতিক সুখ-শান্তি, আরাম আয়েশ, সম্মান মর্যাদা অনেক দিন পর্যন্ত বিদ্যমান

থাকলেও একদিন না একদিন তা নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যাবেই। অবশেষে আল্লাহ তাআলার দরবারে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلْيَسَعْهُ بَيْتَهُ وَلْيَبْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِهٖ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا لِيَغْنِمَ اَوْيَسْكُتْ عَنْ شَرٍّ فَلْيَسْلِمْ

—যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, তার উচিত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর এবাদত করা এবং নিজের গোনাহের জন্যে কান্নাকাটি করা, আর যে আল্লাহ ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান এনেছে, তার উচিত সব সময় ভাল কথা বলা, যাতে সে উপকৃত হয় এবং নিজের রসনাকে মন্দ বলা থেকে বিরত রাখা, যাতে সে আযাব থেকে নাজাত পেতে পারে। — (আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

مَنْ اَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اُكْلَةً فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسٰى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَكْسُوْهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

— যে গীবত করে কোন মুসলমানের এক গ্রাস পরিমাণ ভক্ষণ করে অথবা কোন কাপড় পরিধান করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের খাদ্য খাওয়াবেন এবং আগুনের কাপড় পরিধান করাবেন। —(আবু দাউদ)

দ্বাদশতম কারণ—

মুসলমানকে অপমানিত করার সংকল্প

কোন মুসলমানকে অপমানিত করার এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের মাঝে তার সম্মান মর্যাদা হ্রাস করার উদ্দেশেও অনেক সময় গীবত করা হয়।

প্রতিকার

অন্যকে সতীর্থ বন্ধুবান্ধব মহলে অপমানিত করার উদ্দেশে তার গীবত করতে নিজের মনে মনে ভাববে, ইহজাগতিক অপমান অপদস্থতা পরকালীন সম্মান মর্যাদা লাভের, পক্ষান্তরে দুনিয়ার মর্যাদা আখেরাতে অপমানিত অসম্মানিত হবার কারণ। আজ গীবত করে যাকে অসম্মানিত অপদস্থ করা হচ্ছে, আখেরাতে সে সম্মানিত আর গীবতকারী অসম্মানিত হবে। সেদিন গীবতকারীর নেকীসমূহ গীবতকৃতের আমলনামায় এবং যার গীবত করা হয়েছে তার বদীসমূহ গীবতকারীর আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে।

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) এরশাদ করেন— দুনিয়ায় তুমি মানুষের সম্মানহানি করে, তাদেরকে অপমান অপদস্থ করে আনন্দিত উৎফুল্ল হচ্ছ, কেয়ামতে তুমি কিরূপ অপমান অপদস্থ হবে, তোমার কিরূপ অনিষ্ট হবে, তুমি কেমন লজ্জিত অনুতপ্ত হবে, তা একটুখানি ভেবে দেখ। যেদিন মহান আল্লাহ সামনাসামনি তোমাকে সম্বোধন করবেন, সেদিন তুমি নিঃস্ব নিঃসম্বল এবং তুচ্ছ হবে, সেদিন তোমার কোন সমব্যথী সতীর্থ বন্ধু হবে না, তোমার সব নেকী নিঃশেষ হয়ে অধিকারের দাবীদারদের সব বদী তোমার আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে, তখন তোমার কি দশা হবে। এরূপ চিন্তা করে গীবতের মাধ্যমে অন্যকে হেয় অপদস্থ করা হতে বিরত থাকবে।

ত্রয়োদশতম কারণ—

নিজের নির্দোষিতার আকাঙ্ক্ষা

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা থেকেও অনেক সময় মানুষ অন্যের গীবত করে, যেমন— কেউ কারো কোন দোষ বর্ণনা করল। এখন যার দোষ বর্ণনা করা হল সে তা বর্ণনাকারীর উপর আরোপের ধান্ধায় লেগে যায়। উদ্দেশ্য, নিজেকে মানুষের নিকট নির্দোষ নিষ্কলংক প্রমাণ করে নিজের দোষ বর্ণনাকারীকে হেয় অপদস্থ করা। যাতে মানুষ জানে বুঝে, এ লোক কথিত দোষ হতে মুক্ত পবিত্র।

প্রতিকার

কেউ কারো অবাস্তব দোষ বর্ণনা করলে এক্ষেত্রে বুঝা উচিত, গীবতকারী তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এ অপরাধের শাস্তি দেবেন এবং আমাকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। আর যদি বর্ণনাকারী সত্য দোষই বর্ণনা করে থাকে তা হলে তার প্রতি রুষ্ট হবার কি আছে? বরং নিজের থেকে বর্ণিত দোষ বের করে ফেলার চেষ্টা করা উচিত। তা হলে মানুষ আর তাকে দোষী ভাববে না।

চতুর্দশতম কারণ— প্রবৃত্তির আনন্দলাভ, মানুষকে হাসানো এবং মেয়েদের মন জয়ের জন্য গীবত করা

সমবয়সী সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের মজলিস জমলে তখন হাসতে মন চায় এবং হাসার জন্য দুনিয়ার সব কেস্সা কাহিনী বের হয়। আর মানুষের দোষ বর্ণনাপূর্বক উপস্থিত লোকজন হাসাহাসি করে। বলতে থাকে— অমুক এক আজব পাগল, উদ্ভ্রান্ত, বাজে মানুষ; অমুক একেবারে পাজি, নিতান্তই বিশ্রী, কদাকার; অমুক অসচ্চরিত্রসম্পন্ন; এভাবে প্রত্যেকের দোষ বর্ণনা করে মজলিসে উপস্থিত লোকজন হাসাহাসি করে এবং আল্লাহর রহমত নিশ্চিহ্ন

করে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে মানস প্রকৃতি খামাখাই এবাদত হতে বীতশ্রদ্ধ হয়। যদি কেউ নিজের মানস প্রকৃতির উপর জোর খাটিয়ে এ মজলিসে না আসে, তা হলে উপস্থিতরা তার প্রতি ভর্ৎসনা তিরস্কার বর্ষণ করতে থাকে। বলতে থাকে— অমুক এবাদতে অত্যন্ত মশগুল, সোজা, জান্নাতে চলে যাবে। এ ধরনের কথা বলে তারা সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

প্রতিকার

এরূপ ক্ষেত্রে অনুধাবন করা উচিত, অন্যের আনন্দ খুশীর জন্য নিজের ক্ষতি করা নির্বুদ্ধিতার কাজ। কূপে পড়লে মানুষ খুশী হবে, আনন্দ লাভ করবে, এজন্য কেউ কূপে পড়ার মত নির্বুদ্ধিতার কাজ করে না। অনুরূপ কঠিন গরমে মানুষজন সূর্যোত্তাপে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় কেউ যদি ছায়াময় আরামদায়ক স্থান পায়, তা হলে সে নিজের জন্য আরাম পছন্দ করে তথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সে কঠিন সূর্যোত্তাপে দণ্ডায়মান লোকজনের অনুসরণ করে না। তা হলে বুঝা উচিত, গীবত করায় নিজেরই ক্ষতি এবং মানুষজনের অনুসরণ অনুগমনে নিজেরই লোকসান; সুতরাং এমন ক্ষতিকর অনুসরণ, হাসি এবং আনন্দ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

পঞ্চদশতম কারণ—

অন্যের দোষ বর্ণনা করে নিজের দোষ প্রতিরোধ

কেউ যদি বুঝতে পারে, অমুক লোক আমার গীবত করবে, শাসকের দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, তা হলে সে আগ বাড়িয়ে সন্দেহভাজন লোকটির দোষ বর্ণনা করে দেয়। বলে— অমুক আমার সাথে খুবই শত্রুতা রাখে। সে খুবই মিথ্যাবাদী। এতে তার উদ্দেশ্য, শাসক যেন গীবতে বিশ্বাস করে তাকে খারাপ ভাবতে শুরু না করে।

প্রতিকার

এরূপ ক্ষেত্রে বুঝা উচিত, শাসকের দরবারে কারো আমার দোষ বর্ণনায় আমার দ্বীন-দুনিয়ার কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং তার গীবতে যেখানে আমার কোন ক্ষতি নেই, তখন তার গীবত করার কি দরকার? সে যদি আমার গীবত করেই, তবে নিজের আমলনামাই কালিমালিপ্ত করবে। তার নেকীসমূহ আমাকে দান করবে। দুনিয়ায় আল্লাহ যদি আমার সহায় সাহায্যকারী থাকেন, তা হলে আমি সব বাধা পেরিয়ে যাব। সে যেভাবে আমার দোষ প্রকাশ করবে, অনুরূপ আল্লাহ তাআলাও তার দোষ প্রকাশ করে মানুষের সামনে তাকে হেয় অপদস্থ করবেন। কেননা, কোন মানুষ যখন অন্যের দোষ প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ তাআলাও তার দোষ প্রকাশ করে দেন। সুতরাং গীবতের পিছনে পড়ে কোন লাভ নেই।

অষ্টম শাখা

গীবতের কাফফারা

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব নিজের রসনা সংযত রাখা, যাতে রসনা দ্বারা অন্যের গীবত প্রকাশিত হয়ে নিজের দুনিয়া আখেরাত সব কিছুর বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে। কিন্তু কারো উপর শয়তান প্রবল হয়ে গেলে তার দ্বারা যদি কোন গোনাহ সংঘটিত হয় এবং তা নিছক আল্লাহর হক যেমন নামায রোযা ইত্যাদি পরিত্যাগজনিত গোনাহ হয়, তা হলে এর প্রতিকার হল, আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কিন্তু তওবার জন্য অন্তরে লজ্জা অনুশোচনা, মুখে এস্তেগফার— ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। বান্দা এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন।

আর সংঘটিত গোনাহ যদি বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু তওবা দ্বারা মাফ হবে না। কেননা, হকের অধিকারী কেয়ামতের দিন তার হকের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত গোনাহের সাথে যে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী। সুতরাং গীবত যেহেতু বান্দার হক সংশ্লিষ্ট, তাই শুধু তওবা দ্বারা তা মাফ হওয়া সম্ভব নয়; বরং যার গীবত করা হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করাও জরুরী।

সুতরাং জানা থাকা দরকার, গীবতের সাথে দুইটি হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করো না। অতএব গীবতকারী এক সাথে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা ও শয়তানের তাবেদারী করে। এর কাফফারা হল, গীবতের শাস্তির কথা স্মরণ করে চোখের পানি বহাবে এবং মুখে এস্তেগফার করবে।

বান্দার গীবতজনিত অধিকারের কাফফারা কি হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে তওবা দ্বারাই গীবতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ লওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করা, আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং কল্যাণ বরকতের দোআ করা জরুরী। এসব করলে তবেই গীবতকারী গোনাহ থেকে মুক্ত হবে। বিভিন্ন হাদীস এবং সাহাবায়ে

কেরামের বাণী থেকেও এ মর্মার্থই বুঝা যায়। তৃতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মিটে যাওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে, তার থেকে মাফ লওয়াও জরুরী। গীবতের সংবাদ তার কাছে পৌঁছুক বা নাই পৌঁছুক। চতুর্থ দলের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে এ সংবাদ অবহিত হলে তবেই মাফ লওয়া জরুরী। অন্যথায় তার জন্য শুধু এস্তেগফার করাই গোনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট। নিম্নে গীবতের কাফফারা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, মনীষী বাণী এবং উপদেশমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

كَفَّارَةُ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اِغْتَبْتَهُ

—গীবতের কাফ্ফারা হল, যার গীবত করা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে তার জন্য এস্তেগফার করা। —(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

—গীবতের গোনাহ যেনা হতেও কঠোর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কেন? তিনি জবাবে এরশাদ করেন—

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُلَهٗ حَتّٰى يَغْفِرُهَا لَهٗ صَاحِبُهٗ

—কেউ তওবা করলে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত গীবতকারী দায়িত্বমুক্ত হয় না। —(তাফসীরে দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

يَقْتَصُّ لِلْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتّٰى لِلْجَلْجَاءِ مِنَ الْقَرْنٰى وَحَتّٰى لِلذَّرَّةِ مِنَ الذَّرَّةِ

—কেয়ামতের দিন এক মাখলুক থেকে অন্য মাখলুকের বিনিময় লওয়া হবে। এমনকি যে শিংধারী বকরী শিংবিহীন বকরীকে মেরেছে, কেয়ামতের দিন শিংধারী বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর বিনিময় লওয়া হবে। আল্লাহ

তাআলা শিংবিহীন বকরীকে শিং দিয়ে দুনিয়ায় শিংধারী বকরীকে মারার আদেশ করবেন। শুধু তাই নয়; বরং এক অণুকণার হিসাব অন্য অণুকণা থেকে লওয়া হবে। —(আহমদ—আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْشَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ أُخِذَ مِنْ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ -

—যে কারো প্রতি কোন প্রকারে জুলুম করেছে, সে জুলুম সম্মানহানি অথবা সম্পদ আত্মসাতজনিত হোক, সে দিন আসার আগেই তার তা মাফ করিয়ে নেয়া উচিত, যেদিন কোন দীনার দেরহাম থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তা হলে জুলুমের বিনিময়ে তা মজলুমকে দেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে দাবীদারের বদআমলসমূহ তার উপর চাপানো হবে। —(বোখারী—কেসাস অধ্যায়)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন—

مَنْ ذَكَرَ خَطِيْئَةً فَوَجَدَ قَلْبِهِ مَحَبَّةً مِنْهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ

—যে গোনাহের কথা স্মরণ করে মনে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করে, তার আমলনামা থেকে সব গোনাহ মিটে যায়। —(এহইয়াউল উলূম—তওবা অধ্যায়)

প্রথম ঘটনা

একদিন একটি পিপীলিকা হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বুকের উপর বিচরণ করছিল। তিনি পিপীলিকাটিকে ধরে জমিনের উপর ছুঁড়ে মারেন। পিপীলিকাটি বলল, হে সোলায়মান! আপনি কেন এত বড় সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন। কেয়ামতের দিন নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিপত্তির অধিকারী আল্লাহর দরবারে কি আপনাকে দণ্ডায়মান হতে হবে না। এ কথা শুনতেই হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি পিপীলিকাটিকে বলতে লাগলেন— ওহে পিপীলিকা! আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। পিপীলিকাটি বলল, তিন শর্তে আমি

আপনাকে ক্ষমা করতে পারি। এক— যাঞ্চাকারীকে বিমুখ করবেন না; দুই— অহংকারবশতঃ হাসবেন না; তিন— যথাসাধ্য ফরিয়াদীর ফরিয়াদ পূর্ণ করবেন, তাতে বাড়তি কমতি করবেন না। হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম এ শর্তত্রয় মেনে নিলে পিপীলিকাটি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। —(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস– ইজতিনাবুয যুলম অধ্যায়)

সুতরাং সবারই নিজেদের অপকর্মসমূহ থেকে তওবা করা এবং অন্যের গীবত থেকে বিরত হওয়া, যদি কারও গীবত করা হয়ে থাকে তবে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। তা হলে হাশরের দিন আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক স্ত্রীলোক সম্পর্কে বললেন, সে ঝগড়াটে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি মেয়েলোকটির গীবত করেছ। সুতরাং তোমার তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া আবশ্যক। —(কিমিয়ায়ে সাআদাত)

মনীষী বাণী

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন—

يَكْفِيْهِ الْاِسْتِغْفَارُ دُوْنَ الْاِسْتِحْلَالُ

—গীবতকারীর জন্য শুধু তওবাই যথেষ্ট। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ লওয়ার দরকার নেই।

—(এহইয়াউল উলূম—কাফ্ফারাতুল গীবত অধ্যায়)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রঃ) বলেন—

إِذَا اِغْتَابَ رَجُلٌ رَجُلًا فَلَا يُخْبِرُ بِهٖ وَلٰكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

—কেউ কারো গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে, তাকে না জানিয়ে বরং আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। —(তাফসীরে দোররে মনসূর)

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন—

كَفَّارَةُ اَكْلِكَ لَحْمَ اَخِيْكَ اَنْ تُثْنِىْ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ وَتَدْعُوْ لَهٗ۔

—ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ অর্থাৎ গীবতের কাফফারা হল, তার প্রশংসা করবে, তার জন্য কল্যাণ বরকতের দোআ করবে।

—(এহইয়াউল উলূম—কাফফারাতুল গীবত অধ্যায়)

হযরত আবু আসেম (রঃ) বলেন, আমি যখন থেকে শুনেছি, গীবত হারাম, তখন থেকে আমি কারো গীবত করিনি।

—(ইমাম দামেরী ঃ হায়াতুল হায়ওয়ান, ফীল (হাতী)—এর আলোচনা)

নবম শাখা

গীবতের অপরাধ ক্ষমা করা

কেউ কারো গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে সে গীবতকারীর উপর অধিকারপ্রাপ্তির দাবীদার হয়। কিন্তু গীবতকারী লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ মাফ চাইলে তাকে মাফ করে দেয়া কর্তব্য। যদিও তা জরুরী নয়। কেননা, প্রাপ্য অধিকার মাফ করে দেয়া কারো উপর ওয়াজিব নয়। তাই হযরত সায়ীদ ইবনুল মোসাইয়াব (রঃ) বলেন— لَا أُحَلِّلُ مَنْ ظَلَمَنِىْ —যে আমার উপর জুলুম করেছে, আমি তার এ কাজ কখনও হালাল করব না। অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করব না। কেননা, তার নিকট অধিকার পাওনা থাকায় আমার উপকার নিহিত রয়েছে। —(এহইয়াউল উলূম)

তবে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তার হিসাব ফেলে না রাখা একনিষ্ঠ আবেদ এবং মোত্তাকীদের মর্যাদার উপযোগী। কেননা, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কেউ বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে গোনাহ থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দেয়াই আল্লাহ তাআলার রীতি।

বর্ণিত আছে, হযরত যয়নুল আবেদীন বিন হোসাইন বিন আলী (রাঃ) সকালে ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলতেন— اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَصَدَّقُ الْيَوْمَ بِعِرْضِىْ لِمَنْ يَغْتَابُنِىْ। —হে আল্লাহ! আজ যে আমার গীবত করবে, তাকে আমি আমার মর্যাদা সদকা করে দিলাম। অর্থাৎ, তার গীবতে আমি অসন্তুষ্ট মনোক্ষুণ্ন হব না, তাকে পাকড়াও করব না।

—(ইমাম দামেরী—হায়াতুল হায়ওয়ান)

নিম্নে গীবতের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ كَأَبِيْ ضَمْضَمٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِيْ عَلَى النَّاسِ ـ

—তোমাদের কেউ কি আবু যমযমের মত হতে অপারগ। অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই আবু যমযমের মত হওয়া উচিত। সে যখন স্বগৃহ থেকে বাইরে গমনোদ্যত হত, তখন বলত— হে আল্লাহ্! আজকে আমি আমার সম্মান মর্যাদা মানুষের জন্য সদকা করে দিলাম। যদি কেউ আমার গীবত করে তা হলে আমি তাকে পাকড়াও করব না, অভিযুক্ত করব না। কেননা, আমি তার জন্য গীবত হালাল করে দিয়েছি। —(এহইয়াউল উলূম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ ـ

—জান্নাতের মহামর্যাদাবান এক দরজা রয়েছে। এ দরজা দিয়ে সে ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে তার উপর জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেবে।

—(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস—আলএহসান ইলাল ইয়াতীম অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللّٰهُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهٖ قَالُوْا وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ قَالَ تُعْطِيْ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ـ

—তিনটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ্ তাআলা তার হিসাব সহজ করে দেবেন এবং নিজ রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোন, সে তিনটি কি? তিনি এরশাদ করলেন, তা হচ্ছে— যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়বে, আর যে তোমার উপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করবে।

—(তিবরানীর সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস)

দ্বিতীয় মূল

গীবত শুনার অপকৃষ্টতা

জেনে রাখা উচিত, গীবত করা যেমন হরাম, তেমনি শুনাও হারাম। তাই কেউ কারো গীবত করলে তা শুনা, তাকে বাধা না দেয়া এবং অন্য মুসলমানের সম্মানহানিতে আনন্দিত হওয়া বিরাট গোনাহ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন—

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغِيْبَةِ وَاِسْتِمَاعُ الْغِيْبَةِ

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবত করতে এবং গীবত শুনতে নিষেধ করেছেন। —(সীরাতে আহমদিয়া— আফাতুল আযান অধ্যায়)

কেউ কারো গীবত করতে থাকলে শ্রোতার চারটি করণীয় রয়েছে—

প্রথম— কারো গীবত শুনতে পেলেই তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। গীবতকৃতের যেসব মন্দ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না, অন্যের নিকট বর্ণনা করবে না। মনে করবে, গীবতকারী একটি কবীরা গোনাহ করেছে। সুতরাং কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির কোন কথা ধর্তব্য নয়। সম্ভবতঃ যার গীবত করা হয়েছে, তার সাথে গীবতকারীর কোন শত্রুতা রয়েছে, তাই তার মন্দ দিকগুলোই বর্ণনা করছে। সুতরাং এসব মন্দ বিষয় বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়া অনিশ্চিত।

দ্বিতীয়— কারো গীবত হচ্ছে শুনতে পেলে নিজেও তাতে শরীক হয়ে মুসলমান ভাইয়ের দোষ আরও বেশী করে প্রকাশ করবে না; বরং মনে করবে, গীবতকারী আল্লাহ তাআলার নিকট নিন্দিত তিরস্কৃত। তার অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিও ক্ষ্যাপে যাবেন এবং হাশরের দিন আমাকে আযাব দেবেন।

তৃতীয়— কোন মুসলমানের গীবত হচ্ছে শুনতে পেলে তার প্রশংসা শুরু করা এবং তার সাহায্যে এগিয়ে আসা আবশ্যক, যাতে গীবতকারী অন্য মুসলমানের গীবত হতে বিরত হয়। অন্যথায় কেয়ামতের দিন সে অপদস্থ অপমানিত এবং খুবই দুঃখিত অনুতপ্ত হবে।

চতুর্থ— গীবতকারীকে কথার মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ দেবে, গীবত করতে নিষেধ করবে। অথবা হাত বা চোখের ইশারায় অন্য

মুসলমানের গীবত করতে নিষেধ করবে। শাসক বা প্রভাবশালীদের ভয়ে নিষেধ করা সম্ভব না হলে নিজে মজলিস ছেড়ে সচলে যাবে। এও সম্ভব না হলে মনে মনে গীবতকে মন্দ জানবে। গীবতের প্রতি সন্তুষ্টি দেখিয়ে চুপচাপ মজলিসে বসে থাকবে না।

নিম্নে মুসলমানের গীবতে বাধাদানের ফযীলত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস ও উপদেশমূলক কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে।

মুসলমানের গীবতে বাধাদান এবং তার সাহায্য করার ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَذَابَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

—যে কোন মুসলমানের সম্মানহানিতে বাধা দেবে, এর বিনিময়ে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার থেকে আযাব প্রতিরুদ্ধ করে দেবেন এবং আপন রহমতে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

—(আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

—যে কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাতে তাকে সাহায্য করবেন।

—(ইবনে আবিদ্দুনইয়ার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغِيْبَةِ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ

—যে মুসলমানের সম্মান বিনষ্টি, সম্মানহানি হতে লোকদেরকে বাধা দেবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া আল্লাহ তাআলার উপর হক হয়ে যাবে। —(আহমদ বিন হাম্বলের সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَقْدِرُ اَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ اَذَلَّ اللّٰهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْاَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

— যার সামনে কোন মুসলমানকে অপদস্থ হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, আর সে শক্তি থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করে না, কেয়ামতের দিন সর্বসৃষ্টির সম্মুখে আল্লাহ তাআল্লা তাকে অপদস্থ করবেন।

—(জামেয়ে সগীর ফী হাদীসে বাশীরিন নাযীর)

জামেয়ে সগীর গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আযীযী (রঃ) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা গেল, (শক্তি থাকা সত্ত্বেও) কোন মুসলমানের সাহায্য না করা হারাম; বরং কবীরা গোনাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَا مِنْ اِمْرِءٍ يَخْذُلُ اِمْرَءًا مُسْلِمًا فِيْ مَوْضَعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِى الْمَوْطِنِ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ اِمْرِءٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضَعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ ـ

—কেউ কোন মুসলমানকে যখন এমন স্থানে অপমান অসম্মান করে, যেখানে তার সম্মানহানি কবা হয়, সর্বপ্রকারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে (হাশরের ময়দানে) অপমান করবেন যেখানে নিজের সম্মান তার জন্য খুবই প্রিয় হবে। আর যে কোন মুসলমানকে এমন জায়গায় সাহায্য করে যেখানে তার সম্মানহানি করা হচ্ছে, তবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের সম্মুখে তাকে সম্মানিত করবেন। —(আবু দাউদ—আলবেররে ওয়াসসেলাহ অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ حَمٰى عِرْضَ اَخِيْهِ فِى الدُّنْيَا بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلَ؟ مَلَكًا يَحْمِيْهِ عَنِ النَّارِ

—যে দুনিয়ায় তার মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করবে, কেয়ামতের দিন একজন ফেরেশতাকে আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গী করে দেবেন। এ ফেরেশতা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

—(আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন— مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ —যে কেউ তার মোমেন ভাইয়ের সম্মানহানি প্রতিরোধ করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন।

—(তিরমিযী—আলবেররে ওয়াসসেলাহ অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ اُغْتِيْبَ عِنْدَهٗ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرِهٖ اَدْرَكَهٗ اَثَمَّهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

—যার সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয়, আর শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে মুসলমান ভাইকে সাহায্য করে না (গীবত প্রতিরোধ করে না), আল্লাহ তাআলা উভয় জগতে তাকে শাস্তি দেবেন। —(সীরাতে আহমদিয়া)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ وَيَحُوْطُهٗ مِنْ وَرَائِهٖ

— প্রত্যেক মোমেন পরস্পরের জন্য আয়না স্বরূপ। যেভাবে আয়নার ছবি সম্পর্কে জানা যায়, অনুরূপ প্রত্যেকেই অন্যের দোষ সম্পর্কে অবহিত থাকে। কেননা, নিজের দোষ নিজের দৃষ্টিতে কৌশল বলে মনে হয়। আর প্রত্যেক মুসলমানই অন্য মুসলমানের ভাই। তাই প্রত্যেকেরই পরস্পরকে জানমালের বিনষ্টি হতে রক্ষা করা উচিত, যাতে কেউ কোন প্রকার অভিযোগ না করে, কোন গীবত না করে। —(আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ اَخِيْهِ بِالْغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَعْتِقَهٗ مِنَ النَّارِ

—যে তার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ অর্থাৎ গীবত রোধ করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা আল্লাহর জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।

—(বায়হাকীর সূত্রে মেশকাত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ ـ

— যে কোন শরীঅত নিষিদ্ধ কাজ দেখবে, স্বহস্তে তাতে বাধা দেয়া আবশ্যক। যদি এতে অসমর্থ হয় তা হলে মুখে বাধা দেবে। এও সম্ভব না হলে শুধু মনে মনে তা খারাপ জানবে। আর এ হচ্ছে ঈমানের সর্বদুর্বলতর পর্যায়। —(মুসলিম)

নিম্নে গীবত শোনার অপকৃষ্টতা সম্পর্কিত কয়েকটি শিক্ষামূলক ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের হাওয়ারী— সাহায্যকারীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! যদি তেমাদের মধ্যকার কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির সতর সামান্য খুলে যায়, তা হলে তোমরা কি তা ঢেকে দেবে, নাকি অবশিষ্ট সতরও প্রকাশ করে দেবে। সবাই বলল, আমরা কোন মুসলমানের সতর খোলা দেখলে তা ঢেকে দেব। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন, তোমাদের সামনে কোন মুসলমানের দোষ প্রকাশ করা হলে তোমরা কেন তাতে অংশীদার হও — তার অবশিষ্ট দোষগুলোও প্রকাশ করে দাও; বরং কেউ কারো গীবত করলে তার দোষসমূহ প্রকাশ করলে তা ঢেকে দেয়া তোমাদের জন্য আবশ্যক। গীবতকারীর সাথে যোগ দিয়ে তার অবশিষ্ট দোষগুলোও প্রকাশ করে দেয়া ঠিক নয়। —(তাম্বীহুল গাফেলীন—গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

যেনার কারণে হযরত মায়েয আসলামী (রাঃ)-কে পাথর বর্ষণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে দুই জন পরস্পরে বলাবলি করল, আল্লাহ তাআলা তার যেনার দোষ গোপন করে রেখেছিলেন, অথচ সে নিজেই তা প্রকাশ করে দিয়ে কুকুরের মত নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত কথাবার্তা শুনতে পান। পথে একটি মৃত গাধা দেখতে পেয়ে তিনি উল্লিখিত উক্তিকারীদ্বয়কে বললেন, তোমরা এ মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর। তারা বললেন, এ মৃত গাধার গোশত কে খেতে যাবে? রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা যে এ মাত্র মায়েয (রাঃ)-এর গীবত করলে, তা এ মৃত গাধার চাইতেও নিকৃষ্টতর।

—(ইবনে হাব্বানের সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব)

উল্লিখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়কে গীবতকারী বলেছেন। অথচ এ ঘটনায় একজন গীবতকারী এবং অন্যজন শ্রোতা ছিল। এতে বুঝা গেল, শ্রোতাও গীবতকারীর শরীক। সুতরং যথাসাধ্য গীবতকারীকে এ অপকর্ম হতে নিষেধ করা এবং গীবতের মজলিসে না বসা আবশ্যক।

তৃতীয় ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে অন্যের গীবত করে। একজন গীবতকৃতের পক্ষ হতে তা প্রতিরোধ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ كَانَ لَهُ حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

—যে কারো গীবতে বাধা দেয়, এটা তার জাহান্নামে গমনে প্রতিবন্ধক হবে।

—(এহইয়াউল উলূম— হুকুকুল মোসলেম অধ্যায়)

চতুর্থ ঘটনা

একদিন হযরত মেকদাম বিন মাদীকারেব (রাঃ) আমর বিন আসওয়াদ এবং বনী আসাদ গোত্রের এক লোক হযরত মোআবিয়া (রাঃ)-এর সমীপে আগমন করেন। তখন হযরত মোআবিয়া (রাঃ) হযরত মেকদাম বিন মাদীকারেব (রাঃ)-কে বললেন, হে মেকদাম! আমি শুনেছি, হাসান বিন আলী (রাঃ) ইনতেকাল করেছেন। এ খবর শুনে হযরত মেকদাম (রাঃ) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়েন। এতে সেখানে উপস্থিত বনী আসাদ গোত্রের লোকটি মেকদাম (রাঃ)-কে বলল, আপনি কি হাসান (রাঃ)-এর মৃত্যুকে মসিবত মনে করছেন! সে তো এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছিল, তা নির্বাপিত হয়ে ভালই হল। হযরত মেকদাম (রাঃ) লোকটির এ কথা খুবই মন্দ ভাবেন। তিনি বুঝে ফেলেন, সে হযরত মোআবিয়া (রাঃ)-কে খুশী করার জন্যই এরূপ বলেছে। তাই হযরত মেকদাম (রাঃ) মোআবিয়া (রাঃ)-কে উদ্দেশ করে বললেন, হে মোআবিয়া! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি? হযরত

মোআবিয়া (রাঃ) জবাব দিলেন, হাঁ। এবার হযরত মেকদাম (রাঃ) বললেন, হে মোআবিয়া! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেননি? মোআবিয়া (রাঃ) বললেন, হাঁ, নিষেধ করেছেন। এবার হযরত মেকদাম (রাঃ) বললেন, হে মোআবিয়া! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হিংস্র জন্তুর চামড়ার উপর বসতে নিষেধ করেননি? এবারও হযরত মোআবিয়া (রাঃ) হাঁসূচক জবাব দেন। তখন হযরত মেকদাম (রাঃ) বললেন, হে মোআবিয়া! যেহেতু আপনার ঘরে উক্ত তিনটি নিষিদ্ধ কর্মই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই আপনার সহচররা হযরত হাসান (রাঃ)-এর মত মর্যাদাবান ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে পারছে।

—(আবু দাউদ—জুলূদুল ফাহদ অধ্যায়)

স্মর্তব্য, হযরত মোআবিয়া (রাঃ) লোকটির গীবতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; বরং তিনি নিষেধই করতেন। ইত্যবসরে হযরত মেকদাম (রাঃ) তা করে বসেন। তাই লোকটিকে আর নিষেধ করার প্রয়োজন থাকেনি।

পঞ্চম ঘটনা

হযরত খালেদ রেবয়ী (রাঃ)-এর উপস্থিতিতে লোকজন কারো গীবত করলে তিনি তাদেরকে বাধা দেন। তারা পুনরায় গীবত শুরু করলে হযরত খালেদ রেবয়ী (রঃ)ও তাদের সাথে শরীক হন। সুতরাং স্বপ্নে কেউ তাঁর মুখে শূকরের গোশত পুরে দেন।

ষষ্ঠ ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রঃ)-এর মজলিসে জনৈক ব্যক্তি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর গীবত করে। তিনি লোকটিকে বললেন, ওহে! তুমি ইমাম সাহেবের দোষ বর্ণনা করছ। অথচ তিনি এক অযুতেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। তাঁর এ অবস্থা চল্লিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। —(রদ্দুল মোহতার হাশিয়া দোররে মোখতার)

সপ্তম ঘটনা

হযরত ইবনে আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত, একদিন হাজ্জাজ কুফা এবং বসরার ফকীহদের সকলকে ডেকে পাঠায়। ইবনে আয়েশা (রঃ) বলেন, আমরা সবাই হাজ্জাজের সেখানে উপস্থিত হলাম। হযরত হাসান বসরী

(রঃ)ও আসেন। এর পর হাজ্জাজ মানুষের আলোচনা শুরু করে। এমনকি হযরত আলী (রাঃ)-এর আলোচনাও এসে পড়ে। হাজ্জাজ হযরত আলী (রাঃ)-এর গীবত শুরু করে দেয়। আমরাও হাজ্জাজের অনুসরণে গীবত শুরু করে দেই। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রঃ) চুপচাপ বসে থেকে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুল দাঁতে কামড়াচ্ছিলেন। এবার হাজ্জাজ বলল, হাসান! তুমি চুপ চাপ বসে আছ কেন? আলী সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?

এবার হযরত হাসান বসরী (রঃ) বললেন, আলী (রাঃ) সে জন, যাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। তিনি আলী (রাঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই। এ শুনে হাজ্জাজ অত্যন্ত খাপ্পা হয় এবং তার চেহারা লাল হয়ে যায়। অবশেষে সে উঠে ঘরে চলে যায়।

—(এহইয়াউল উলূম—আমরুল ওমারা বিলমারূফ অধ্যায়)

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন— اَلسَّاكِتُ شَرِيْكُ الْمُغْتَابِ —যে গীবত শুনে চুপ থাকে সেও গীবতে শরীক রয়েছে। অর্থাৎ, সেও গীবতকারীর মতই গোনাহগার হবে।

সারকথা, প্রত্যেক মানুষেরই গীবত করা ও শ্রবণ হতে পরিপূর্ণভাবে আত্মরক্ষা করে চলা এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দোআ প্রার্থনা করা কর্তব্য।